



- ☑ পরজীবী, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া
- ☑ ক্যান্সার ও ক্যান্সার-চিকিৎসা

- ☑ HIV/AIDS
- ☑ রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা

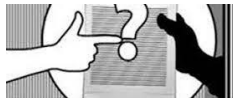
BCS Syllabus on Disease and Healthcare

Disease and Healthcare: Deficiency, Infection, Antiseptic, Antibiotics, Stroke, Heart Attack, Blood Pressure, Hypertension and Diabetes, Dengue; Diarrhoea; Drug addiction, Vaccination, Cataract, food poisoning, X-ray; Ultrasonography; CT Scan; MRI; ECG; Endoscopy; Radiotherapy; Chemotherapy; Angiography, ses, risk and side-effects of above techniques; Basic concept of Cancer, AIDS and Hepatitis.

BCS বিগত সালের প্রশ্নাবলি

- ☐ ডেঙ্গু জ্বরের কারণ ও লক্ষণসমূহ লিখুন। ডেঙ্গু ভাইরাসের জেনেটিক উপাদানটি লিখুন। (৪০তম বিসিএস)
- ☐ ডেঙ্গু ভাইরাসের বিস্তার রোধে আমাদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর নয় কেন? (৪০তম বিসিএস)
- ☐ রাতকানা রোগ কী? কী কারণে রাতকানা রোগের সৃষ্টি হয় বিস্তারিত আলোচনা করুন। এ রোগ প্রতিকারে কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত? (৪০তম বিসিএস)
- ☐ রক্ত কণিকাসমূহ কী কী? রক্ত লাল দেখায় কেন? হেপাটাইটিস কী? কী কারণে হেপাটাইটিস হয়? রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিত দুটি হেপাটাইটিস ভাইরাসের নাম লিখুন। (৪০তম বিসিএস)
- ☐ অ্যান্টিসেপটিক কী? চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত তিনটি উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিসেপটিকের নাম লিখুন। (৪০তম বিসিএস)
- ☐ উচ্চ রক্তচাপ কি? এর লক্ষণ ও কারণসমূহ আলোচনা করুন। (৩৮তম বিসিএস)
- ☐ রোগ নির্ণয়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ৪ টি গুরুত্ব আলোচনা করুন। (৩৮তম বিসিএস)
- ☐ ঔষধ প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া উদ্ভব কী কারণে হচ্ছে? (৩৭তম বিসিএস)
- ☐ কোন ধরনের কার্যক্রম এর বিস্তাররোধে সহায়ক হতে পারে? (৩৭তম বিসিএস)
- ☐ BMI মানদণ্ডে মানুষের শরীরের যত্ন কীভাবে সম্পন্ন হবে তা ব্যাখ্যা করুন। (৩৭তম বিসিএস)
- ☐ মানুষের শরীরে অধিক পরিমাণ ফাস্টফুড খাওয়ার প্রতিক্রিয়া কী রূপ? (৩৭তম বিসিএস)
- ☐ দুজন শ্রমিক জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে কাজ করেন। কাশি ও বুকে ব্যথাসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগছেন। পরীক্ষায় দেখা যায় একজনের শ্বসন অঙ্গের কোষ বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। অন্যজনের রোগ শ্বসন অঙ্গ ছাড়াও অন্ত্র ও হাড়ে বিস্তার লাভ করেছে। (৩৭তম বিসিএস)
- ☐ দুজন শ্রমিকের শ্বসন অঙ্গের রোগ দুটির নাম লিখুন। (৩৭তম বিসিএস)
- ☐ দুজন শ্রমিকের রোগের মধ্যে কোনটির নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর এবং কেন তা ব্যাখ্যা করুন। (৩৭তম বিসিএস)
- ☐ Zika Virus এ আক্রান্ত মানুষের লক্ষণ, নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করুন। (৩৭তম বিসিএস)
- ☐ খেজুরের রসের মাধ্যমে সংক্রমণযোগ্য ভাইরাসের নাম লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)
- ☐ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতি সম্প্রতি ও নিকট অতীতে ছড়িয়ে পড়া তিনটি ভাইরাসজনিত রোগের নাম লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)
- ☐ ডেঙ্গু হিমোরাজিক ফিভার এর লক্ষণসমূহ কি কি? এর চিকিৎসা উল্লেখ করুন। (৩৪তম বিসিএস)
- ☐ এল.ডি.এল ও এইচ.ডি.এল. কি? মানবদেহের এদের কাজ কি? (৩৪তম বিসিএস)
- ☐ রক্তের আর.এইচ ফ্যাক্টর কী? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? (৩৪তম বিসিএস)
- ☐ মানুষের রক্তের গ্রুপ গুলো কী কী? রক্তের R_h বা রেসাস ফেক্টর কি? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? (৩৩, ২৫, ২৪ ও ১৫তম বিসিএস)
- ☐ রক্তচাপ কি systolic ও Diastolic pressure বলতে কি বুঝায়? রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম লিখুন। (৩৩, ২৫ ও ১১তম বিসিএস)
- ☐ কেমিওথেরাপি কি? ইহা কেন ব্যবহার করা হয়। (৩৩, ১০তম বিসিএস)
- ☐ মানব দেহে কিডনীর কাজ কী? (৩৩তম বিসিএস)
- ☐ অতি পরিচিত ৫টি পানিবাহিত রোগের নাম লিখুন। (৩৩তম বিসিএস)

- ☐ Angins বলতে কী বুঝায়? Heart Aattack ও Stroke এর মধ্যে পার্থক্য কি? Coronary Angiography কি? হৃদরোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত Coronary by-pass ও 'angiography'-এর মধ্যে পার্থক্য কি? Pacemaker কি? (৩১, ৩০, ২৮, ২৩, ২১তম বিসিএস)
- ☐ ব্লাড ক্যান্সার কত প্রকার? এর চিকিৎসা সম্পর্কে লিখুন। (৩১তম বিসিএস)
- ☐ উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) কি? উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ, কারণ ও প্রভাবগুলো বর্ণনা করুন। (৩০তম বিসিএস)
- ☐ Anthrax কি? এ রোগের উৎস, বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (৩০ ও ২৭তম বিসিএস)
- ☐ প্যারাসাইট ও ভাইরাস বলতে কি বুঝায়? এরা কিভাবে দেহকে রুগ্ন করে? (২৯তম বিসিএস)
- ☐ কোলেস্টেরল কি? এলডিএল ও এইচডিএল কি? কোলেস্টেরল মানব দেহে কি ক্ষীত করে? কিভাবে কোলেস্টেরল কমানো যায়? (২৯, ২৭, ২৪, ১৩ ও ১০তম বিসিএস)
- ☐ HIV কি? AIDS কি? HIV/AIDS কিভাবে ছড়ায়? এর রোগের আক্রমণের লক্ষণ ও প্রভাব আলোচনা করুন। কিভাবে HIV/AIDS প্রতিরোধ করা সম্ভব। (২৯, ২৭, ২৪, ২৩, ১৫ ও ১০তম বিসিএস)
- ☐ রোগ নিরূপণে EEG, ECG এবং CT-Scan এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন। (২৯, ২০তম বিসিএস)
- ☐ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন কি? এটির জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগের নাম লিখুন। (২৭তম বিসিএস)
- ☐ খাবার স্যালাইনে ব্যবহৃত চিনি/গুড়া ও লবণের প্রয়োজন কি? (২৭তম বিসিএস)
- ☐ ডেঙ্গু রোগে রক্তের কণিকা ভেঙে যায়? এই রোগ কিভাবে বাহিত হয়? (২৫তম বিসিএস)
- ☐ ডায়রিয়ায় ডাবের পানি উত্তর কেন? (২৫তম বিসিএস)
- ☐ মানবদেহে কিডনির কাজ কি? (২৩তম বিসিএস)
- ☐ মানবদেহে শিরার মধ্যে বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করানো বিপজ্জনক কেন? (২৩তম বিসিএস)
- ☐ 'Test-tube' শিশু কি? (২৩তম BCS)
- ☐ জলাতঙ্ক কি? এর কারণ ও প্রতিকারের উপায় উল্লেখ করুন। (২৩তম BCS)
- ☐ ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) এবং ভাইরাস (Virus) এর মধ্যে পার্থক্য কি? (২০তম BCS)
- ☐ পাতলা পায়খানা হলে স্যালাইন খাওয়ানো হয় কেন? (২০তম BCS)
- ☐ পাইয়োরিয়া ও ফাইলেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? (১৭তম BCS)
- ☐ ভাইরাস কি? ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্বসমূহ আলোচনা করুন। (১৭তম BCS)
- ☐ ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ নিবারণে সবুজ শাকসবজি কিছু তেল দিয়ে রান্না করে খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এখানে তেলের ভূমিকাটা কি? (১৩তম BCS)
- ☐ ক্যান্সার কোষের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ কোষের পার্থক্য মূলত কি? (১৩তম BCS)
- ☐ ডায়রিয়া হলে যে লবণ গুড়ের শরবত খাওয়ানো হয়, তাতে লবণ ও গুড়ের (অথবা চিনির) ভূমিকা কি? (১৩তম BCS)
- ☐ কি ক্রটির জন্য বহুমূত্র রোগ হয়? (১১তম BCS)
- ☐ বাতজ্বরের লক্ষণ কি? (১১তম BCS)
- ☐ শিশুদের কখন কোন টিকা দেয়া দরকার? ক) বি. সি. জি. (যক্ষ্মারোগ), খ) হাম, গ) পোলিও। (১১তম BCS)
- ☐ চোখের ছানি অপারেশনে কি করা হয়? (১১তম BCS)



যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. প্যারাসাইট বা পরজীবী ও ভাইরাস বলতে কি বুঝায়? এরা কিভাবে দেহকে রুগ্ন করে?
২. করোনা ভাইরাস কি? এটি কিভাবে ছড়ায়? রোগের লক্ষণ ও করণীয় আলোচনা করুন।
৩. কোলেস্টেরল কি? এলডিএল ও এইচডিএল কি? কোলেস্টেরল মানব-দেহে কি ক্ষতি করে? কিভাবে কোলেস্টেরল কমানো যায়?
৪. হৃদরোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত Coronary by-pass ও 'angioplasty'-এর মধ্যে পার্থক্য কি?
৫. মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন কি? এটির জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগের নাম লিখুন।
৬. হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন?
৭. এনজিওগ্রাফি (Angiography) কি? এনজিওগ্রাম পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।
৮. HIV কি? AIDS কি? HIV/AIDS কিভাবে ছড়ায়? এর রোগের আক্রমণের লক্ষণ ও প্রভাব আলোচনা করুন। কিভাবে HIV/ AIDS প্রতিরোধ করা সম্ভব?
৯. কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য কাকে বলে? এরা কিভাবে রোগ তৈরি করে?
১০. হেপাটাইটিস কি? এটি কি কারণে হয়? এর জন্য দায়ী জীবাণু কতরকমের হয় কোন জীবাণুগুলো রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়?

□ দুজন শ্রমিক জাহাজ ভাঙা শিল্পে কাজ করেন। কাশি ও বুকে ব্যথাসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগছেন। পরীক্ষায় দেখা যায় একজনের শ্বসন কাড়ি হবে না। অঙ্গের কোষ বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। অন্যজনের রোগ শ্বসন অঙ্গ ছাড়াও অঙ্গ ও হাড়ে বিস্তারলাভ করেছে।

(৩৭তম, ৩৬তম বিসিএস)

ক. Benign ও Malignant ব্যাখ্যা করুন।

খ. দুজন শ্রমিকের শ্বসন অঙ্গের রোগ দুটির নাম লিখুন।

গ. দুজন শ্রমিকের রোগের মধ্যে কোনটির নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর এবং কেন তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. Zika virus- এ আক্রান্ত মানুষের লক্ষণ, নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করুন।

সমাধান :

ক. Benign ও Malignant ব্যাখ্যা করুন।

Benign বলতে রোগের স্বাভাবিক অবস্থাকে বোঝায়। যেসব রোগের ফলে ক্যান্সারের সৃষ্টি হয় না, রোগীর মৃত্যু ঘটে না অর্থাৎ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, এমন রোগের ক্ষেত্রে 'Benign' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। Malignant বলতে রোগের বিপজ্জনক বা তীব্র অবস্থাকে বোঝায়। যেসব রোগের ফলে ক্যান্সারের সৃষ্টি হয়, রোগীর মৃত্যু ঘটে অর্থাৎ রোগী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, এমন রোগের ক্ষেত্রে 'Malignant' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির যদি Benign টিউমার হয় তবে তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে, আশেপাশে বা শরীরের অন্য কোনো স্থানে ছড়িয়ে পড়বে না, ক্যান্সারের সৃষ্টি করবে না। রোগী ঔষধের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি Malignant টিউমার হয় তবে তা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, শরীরের অন্যজায়গায় ছড়িয়ে পড়বে, ক্যান্সার সৃষ্টি করবে, এক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

খ. দুজন শ্রমিকের শ্বসন অঙ্গের রোগ দুটির নাম লিখুন।

প্রথম জনের রোগটির নাম মেসোথেলিওমা; যা ফুসফুস আবরণীর এক ধরনের টিউমার। এটি Benign প্রকৃতির। দ্বিতীয় জনের রোগটির নাম মেসোথেলিয়াল ক্যান্সার; যা ফুসফুস আবরণীর এক ধরনের ক্যান্সার। এটি Malignant প্রকৃতির। উভয় প্রকার রোগেই জাহাজ ভাঙা শিল্পে দীর্ঘদিন অ্যাসবেস্টাস এর সংস্পর্শে আসার কারণে হয়ে থাকে।

গ. দুজন শ্রমিকের রোগের মধ্যে কোনটির নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর এবং কেন তা ব্যাখ্যা করুন।

প্রথম জনের ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর। কারণ তা কেবল ফুসফুসেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কেবল টিউমার অপসারণের মাধ্যমেই রোগটি থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ সম্ভব। অপরদিকে দ্বিতীয় জনের রোগ অঙ্গ ও হাড়ে বিস্তারলাভ করায় তা নিরাময় কঠিনতর। কেননা এক্ষেত্রে টিউমার অপসারণ ছাড়াও কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপির প্রয়োজন হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের ক্যান্সার যা প্রাথমিক অঙ্গ থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে, তা নিরাময় সম্ভাবনা খুবই কম হয়ে থাকে।

ঘ. Zika virus- এ আক্রান্ত মানুষের লক্ষণ, নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করুন।

জিকা ভাইরাস আবিষ্কৃত হয় ১৯৪৭ সালে। এটি একটি মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাস সমগোত্রীয় RNA ভাইরাস। ইয়েলো ফিভার গবেষকরা উগান্ডার জিকা বনে বানরের উপর গবেষণা করার সময়ে বানরের শরীরে এই ভাইরাসের দেখা পান। তখন জিকা বনের নাম অনুসারেই এই ভাইরাসের ২০১৮ সালে নাইজেরিয়াতে প্রথম মানুষের শরীরে এই ভাইরাস পাওয়া যায়। এরপর সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকা এই ভাইরাসটি সাম্প্রতিক সময়ে দেশে দেশে আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লক্ষণ: প্রতি পাঁচজন জিকা ভাইরাস আক্রান্ত মানুষের মাঝে একজনের রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে রোগের লক্ষণ। প্রকাশ পেতে কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত মানুষের লক্ষণগুলো হলো-

i) জ্বর হওয়া; ii) গায়ে র্যাশ ওঠা; iii) গাঁটে ব্যথা; iv) চোখ লাল হয়ে যাওয়া, চোখের পর্দার প্রদাহ ইত্যাদি। এছাড়াও মাথাব্যথা ও পেশি ব্যথা থাকতে পারে।

নিবারণ: জিকা ভাইরাস নিবারণের জন্য এখনো কোনো টিকা বা নির্দিষ্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। আক্রান্ত রোগীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে। প্রচুর পানীয় পান করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণ: এই ভাইরাস থেকে নিয়ন্ত্রণের উপায় হলো - i) মশা থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখা; ii) ঘরবাড়ি মশা মুক্ত রাখা; iii) ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার রাখা; iv) মশার বিস্তার রোধ করা; v) মশাআক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাপদে থাকা।

□ খেজুরের রসের মাধ্যমে সংক্রমণযোগ্য ভাইরাসের নাম লিখুন।

(৩৫তম BCS)

খেজুর রসে সংক্রমণযোগ্য ভাইরাস হলো নিপাহ ভাইরাস। এর একমাত্র বাহক বাদুড়। বাদুড় থেকে খেজুর রসে এবং সেই রস মানুষ খেলে তা মানুষের দেহে। সংক্রমিত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম ২০০১ সালে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে। খেজুর রসের পাতিলে বসে বাদুড় তাতে মুখ লাগিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে খেজুর রসের সাথে বাদুড়ের মুখের লাল মিশে যায়, পাঠে বাদুড়ের বিষ্ঠা ও মুত্র সংমিশ্রণের সম্ভাবনাও থাকে। এ লাল ও মুত্র মিশ্রিত রস পান করে মানুষ প্রাণঘাতি নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। আবার বাদুড়ের খাওয়া, মুখ লাগানো বা ঠোকরানো ফলের মাধ্যমে নিপাহ ভাইরাস সংক্রমিত হয়। নিপাহ ভাইরাস প্রতিরোধে প্রথম করণীয় হলো কোন অবস্থাতে কাঁচা খেজুরের রস খাওয়া যাবে না। ৭০° সে. তাপমাত্রায় রস সিদ্ধ করলে নিপাহ ভাইরাস ধ্বংস হয়ে যায়। তাই খেজুরের রস সিদ্ধ করতে হবে। ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ার নিপাহ গ্রামে প্রথম এই প্রাণঘাতি ভাইরাস দেখা দেয়। তখন বাদুড়ের খাওয়া ফল শুকর খাওয়ার পর শুকর থেকে মানুষের দেহে এ ভাইরাস সংক্রমিত হয়। ঐ গ্রামের নামানুসারে ভাইরাসটির নামকরণ হয় নিপাহ ভাইরাস।

- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতি সম্প্রতি ও নিকট অতীতে ছড়িয়ে পড়া তিনটি ভাইরাসজনিত রোগের নাম লিখুন। (৩৫তম BCS)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতি সম্প্রতি ও নিকট অতীতে ছড়িয়ে পড়া তিনটি ভাইরাস হলো নিপাহ ভাইরাস, ইবোলা ভাইরাস ও সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস।

- প্যারাসাইট বা পরজীবী ও ভাইরাস বলতে কি বোঝায়? এরা কিভাবে দেহকে রুগ্ন করে? (২৯তম BCS)

প্যারাসাইট বা পরজীবী : যেসব জীব সারাজীবন বা জীবনের কোন একপর্যায়ে বা একাধিক পর্যায়ে জীবনধারণের জন্য ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীবদেহে বসবাস করে, এবং পরিণামে পোষকের ক্ষতি করে, তাদের প্যারাসাইট বা পরজীবী বলে। যেমন : গোলক্ৰিমি মানুষের দেহের অন্তঃপরজীবী, উঁকুন বহিঃপরজীবী হিসাবে মানুষের দেহে বসবাস করে।

ভাইরাস : ভাইরাস হলো নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত এক প্রকার অতি আণুবীক্ষণিক অকোষীয়, রোগ সৃষ্টিকারী, সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম একপ্রকার জীবাণু যা সুনির্দিষ্ট পোষক কোষে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কেবল সেখানেই বংশবৃদ্ধি করতে পারে আবার জীবকোষের বাইরে জড় পদার্থের ন্যায় আচরণ করে।

উদাহরণ : ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, টোবাকো মোজাইক ভাইরাস T2 ব্যাকটেরিওফার্ম ইত্যাদি। দেহকে রুগ্ন করার প্রক্রিয়া: পোষকদেহ সব সময় পরজীবী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্যারাসাইট বা পরজীবী অনেক সময় পোষক দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে এবং বিষাক্ত দ্রব্য নিঃসৃত করে পোষকের মৃত্যু ঘটায়।

কোন জীব বা প্রাণীদেহের কোষে ভাইরাস সংক্রমণের পর এর নিউক্লিক এসিড কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কোষের মধ্যে নিউক্লিক এসিড প্রবেশ করার পর এটি কোষের জেনেটিক উপাদানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় নিউক্লিক এসিড তৈরি করতে থাকে। এভাবে পরবর্তীকালে ভাইরাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো তৈরি হয় এবং তা একসঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে পোষক কোষকে বিনষ্ট করে নতুন নতুন ভাইরাস বিমুক্ত হয়। ফলশ্রুতিতে পোষকদেহ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

- ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) এবং ভাইরাস (Virus) এর মধ্যে পার্থক্য কি? (২০তম BCS)

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) এবং ভাইরাস (Virus)- এর মধ্যে পার্থক্য

ব্যাকটেরিয়া	ভাইরাস।
ক. কোষীয়।	ক. অকোষীয়।
খ. আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস আছে।	খ. নিউক্লিয়াস নেই।
গ. ব্যাকটেরিয়ায় DNA ও RNA উভয়ই পাওয়া যায়।	গ. ভাইরাস কখনও DNA ও RNA একত্রে থাকে না।
ঘ. সাইটোপ্লাজম আছে।	ঘ. সাইটোপ্লাজম নেই।

- ভাইরাস কি? ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্বসমূহ আলোচনা করুন। (১৭তম BCS)

ভাইরাস হচ্ছে সূক্ষ্মদেহী অতি আণুবীক্ষণিক জীব। ভাইরাস অকোষীয়, কেবলমাত্র নিউক্লিয়ক এসিড ও প্রোটিন আবরণ দ্বারা গঠিত। এরা জীব দেহের ভিতরে কিংবা বাইরে অবস্থান করতে পারে। আবার ভাইরাস জীবিত অথবা মৃত উভয় দেহেই বাস করতে পারে। ভাইরাস গাছপালা, জীবজন্তু সবার মধ্যেই রোগ ছড়ায়। বসন্ত, পোলিও, হাম ইত্যাদি অনেক রোগ ভাইরাস ছড়ায়।

▲ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

ক) ভাইরাস জীবদেহের ভেতর কিংবা বাইরে বসবাস করতে পারে।

- খ) ভাইরাস জীবিত ও মৃত উভয় দেহেই বাস করতে পারে।
 গ) ভাইরাস কেবলমাত্র (উপযুক্ত) পোষক কোষে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।।
 ঘ) ভাইরাস প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক এসিড সমন্বয়ে গঠিত।

❖ ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- ক) ভাইরাস থেকে হাম, পোলিও এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরী করা হয়।
 খ) ভাইরাস জেনেটিক কৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
 গ) ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করার কাজে যেসব ভাইরাস কাজ করে তাদের ব্যাকটেরিও ফায বলে।



❑ ভাইরাসের উপকারিতা এবং অপকারিতা লিখুন?

❖ উপকারিতা:

- ক) বসন্ত, প্লেগ, পোলিও, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুতিতে ভাইরাস ব্যবহৃত হয়।
 খ) ব্যাকটেরিওফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়াঘটিত আমাশয়ের হাত থেকে মানুষকে বাঁচায়।
 গ) মাটিতে ভাইরাস অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া ইত্যাদির মৃত্যু ঘটিয়ে তাদের দেহকে মাটিতে সার হিসাবে রূপান্তর করে।
 ঘ) জিনতত্ত্বের গবেষণা বস্তু হিসাবে ভাইরাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

❖ অপকারিতা:

- ক) মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগ বিভিন্ন ভাইরাসের মাধ্যমে হয়।
 খ) গরু ও মহিষের পা ও মুখের ক্ষতরোগ এবং কুকুর বিড়ালের “জলাতঙ্ক” ভাইরাসের মাধ্যমে হয়।
 গ) উদ্ভিদের মোজাইক, লিফরোল প্রভৃতি রোগের কারণ ভাইরাস।
 ঘ) মানুষের উপকারী প্রচুর সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে থাকে।

❑ ভাইরাসজনিত রোগগুলো কি কি?

❖ ভাইরাসজনিত রোগ:

- ১) মানুষের রোগ: ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, হার্পিস, হাম, বসন্ত, এইডস, প্রভৃতি।
- ২) গৃহপালিত পশুর রোগ: গরু ও মহিষের পা ও মুখের ক্ষত রোগ এবং কুকুর ও বিড়ালের জলাতঙ্ক, মুরগীর রাণীক্ষেত ও বসন্ত রোগ প্রভৃতি।
- ৩) উদ্ভিদের রোগ: উদ্ভিদের মোজাইক, ও লিফরোল প্রভৃতি।

❑ ব্যাকটেরিয়া কি? ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগগুলো কি কি?

ব্যাকটেরিয়া: ব্যাকটেরিয়া এককোষী আণুবীক্ষণিক জীব। জীবজগতে এরা সর্বাপেক্ষা সরল, ক্ষুদ্রতম এদের কোষপ্রাচীর লিপিড, পলিমার, প্রোটিন দ্বারা গঠিত, এরা আদিকোষী। এদের কোষ বিভাজন হয় অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে, এরা সাধারণত ক্ষতিকর জীব হিসাবে পরিচিত থাকলেও এরা মানুষ ও পরিবেশের অনেক উপকারসাধন থাকে।

❖ ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগগুলো:

- i) প্রাণিজ রোগ: যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, ডিপথেরিয়া, আমাশয়, ধনুষ্ঠংকার, হুপিং কাশি, ইত্যাদি।
- ii) উদ্ভিদের রোগ: আলুর রিংরোগ, ধান ও শিমের লেট ব্লাইট রোগ, টমেটো, আলু, শসা ও কুমড়া জাতীয় গাছের উইল্ট রোগ, লেবু গাছের ককট রোগ ইত্যাদি।
- iii) পানি দূষণ: অনেক ব্যাকটেরিয়া পানির সঙ্গে মিশে পানি দূষণ ঘটায়।

❑ নিপাহ ভাইরাস কি? এটি কিভাবে ছড়ায়? রোগের লক্ষণ ও করণীয় আলোচনা করুন।

নিপাহ ভাইরাস : এটা প্যারামিক্রোভিরিডি পরিবারের অন্তর্গত একটি ভাইরাস। ১৯৯৮ সালের দিকে মালেশিয়ায় প্রথম নিপাহ ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাহক: টেরোপডিডি (Tteropodidae) গোত্রের বাদুড়ই নিপাহ ভাইরাসের প্রধান বাহক। এ বাদুড়ের আরেক নাম লার্জ ফ্লাইং ফক্স তবে গুকের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।

যেভাবে ভাইরাস ছাড়াই: টেরোপডিডি গোত্রের বাদুড়ের মুখের লাল, মূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটে। এর প্রাথমিক বাহক হিসেবে কাজ করে ঐ বাদুড়ের লাল ও মূত্র। খেজুরের কাঁচা রস, আংশিক খাওয়া ফলমূল ইত্যাদির মাধ্যমে এ ভাইরাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসটি কার্যকরী সংক্রামক হওয়ায় তা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে পারে।

❖ রোগের লক্ষণ:

- মানবদেহে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর। সর্দি, তীব্র মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও বমিভাব হয়।
- চরম পর্যায়ে মস্তিষ্কে প্রদাহ হলে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে রোগী আবোল-তাবোল বকতে পারে।
- খিচুনি ও অজ্ঞান ও হতে পারে।

❖ আক্রান্ত হলে করণীয়:

- আক্রান্ত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব দূরে থেকে সেবাশুশ্রূষা করা যেতে হবে।
- রোগী ব্যবহৃত জিনিস পত্র ব্যবহার করা যাবে না।
- রোগীর সাথে একই বিছানায় ঘুমানো যাবে না।
- আক্রান্ত ব্যক্তির লাল ও হাঁচি-কাঁশি থেকে দূরে থাকতে হবে।
- তাৎক্ষণিকভাবে রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে।

❖ সতর্কতা: সরাসরি নিপাহ ভাইরাসের নিরময়ের কোন ওষুধ বা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় -

- পাখি দ্বারা আধা বা আংশিক ফল খাওয়া ও খেজুরের কাঁচা রস পান করবেন না এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করুন।
- যে কোন ধরনের ফলমূল পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোমতো ধুয়ে খান।
- আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসার পর সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।

❑ মানুষের রক্তের গ্রুপগুলো কি কি? রক্তের Rh বা রেসাস ফেক্টর কি? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? (৩৪, ২৫, ২৪ ও ১৫তম BCS)

রক্তের গ্রুপ: মানুষের রক্তের গ্রুপ চারটি। এগুলো হলো- A (এ), AB (এবি), B (বি), এবং O (ও)।

Rh ফ্যাক্টর: রেসাস প্রজাতির বানরের রক্তে একটি এন্টিজেন থাকে। এটাকে রেসাস এন্টিজেন জবা ফ্যাক্টর বলে। কোনো কোনো মানুষের রক্তের কণিকায় Rh, এগুটিনোজেন নামক বিশেষ উপাদান থাকে। এ এন্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিবেচনা করেই মানুষের রক্তের গ্রুপ Rh পজিটিভ ও Rh নেগেটিভ এ দু শ্রেণীতে বিভক্ত।

❖ Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব:

- 1) Rh নেগেটিভ মানুষকে Rh পজিটিভ মানুষের রক্ত দান করলে এবং Rh নেগেটিভ কোন মহিলার সাথে Rh পজিটিভ পুরুষের বিয়ে হলে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।
- 2) রক্তের বিভিন্ন রোগ যেমন- Hydrops foetalis, Erythroblastosis foetalis ইত্যাদি রক্তের Rh ফ্যাক্টরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

❑ কোলেস্টেরল কি? এলডিএল ও এইচডিএল কি? কোলেস্টেরল মানব-দেহে কি ক্ষতি করে? কিভাবে কোলেস্টেরল কমানো যায়? (৩৪, ২৯, ২৭, ২৪, ১৩ ও ১০তম BCS)

কোলেস্টেরল: কোলেস্টেরল এক জাতীয় স্টেরয়েড একোহল। এটি পানিতে অদ্রবণীয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয় বলে স্নেহ জাতীয়পদার্থের দলভুক্ত। আমরা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় যে খাবার খাই, তা আমাদের শরীরের ভেতর বিপাকের পর নানা বিক্রিয়ায় ভেঙে গিয়ে নতুন নতুন উপাদানে পরিণত হয়। এমনি একটি উপাদান হচ্ছে এসিটিক এসিড বা এসিটেট। কোলেস্টেরলের উৎপত্তি এই এসিটেট থেকে। কোলেস্টেরল আমাদের রক্তনালী ও কোষে অবস্থান করে, বিশেষ করে নার্ভাস টিস্যুতে এর পরিমাণ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এ কোলেস্টেরল যখন আমাদের রক্তনালীতে জমাট বাঁধতে শুরু করে তখনই দেখা দেয় হাইপারটেনশন ও হৃৎপিণ্ডের নানা অসুখ তথা হৃদরোগ।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কোলেস্টেরল আবিষ্কৃত হয়। রক্তের মধ্যে, বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যে এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিশেষভাবে মগজ, যকৃৎ এবং ধমনীতে ইহা পাওয়া যায়। চর্বি এবং কোলেস্টেরলের অতিরিক্ত অংশ আরটারিস (arteries) বা ধমনীর গায়ে জমা হতে থাকে। ইহার ফলে আরটারিস শক্ত হয়ে যায় এবং রক্তের অবাধ চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলস্বরূপ আরটারিসে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ কমে যায় এবং সেই সঙ্গে শরীরের জীবনদায়ক অংশগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহও কমে যায়।

❏ কোলেস্টেরল এর প্রকারভেদ:

ক) এলডিএল (LDL): এলডিএল- এর পূর্ণ অভিযুক্ত Low Density Lipoprotein, যা প্রাণিজ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়। এটি রক্তনালীর প্রাচীরগায়েজমে রক্তনালী সংকুচিত করে এবং রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এটিকে খারাপ কোলেস্টেরলও বলা হয়।

খ) এইচডিএল (HDL): এইচডিএল- এর পূর্ণ অভিযুক্ত High Density Lipoprotein, যা উদ্ভিজ্জ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়। রক্তের প্রায় ৩০% কোলেস্টেরল এতে সম্বলিত থাকে। একে মানবদেহের ভালো কোলেস্টেরলও বলা হয়।

কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার: অধিক কোলেস্টেরলযুক্ত চারটি খাবার হলো- ডিমের কুসুম, মাখন, গরুর মগজ, খাসীর কলিজা।

মানবদেহে কোলেস্টেরলের প্রভাব: খাদ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল থাকলে তা করোনারী আর্টারী অর্থাৎ যে সব শিরা বা ধমনীগুলো হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে তাতে জমা হয়। ফলে করোনারী আর্টারী বন্ধ হয়ে বা অত্যন্ত সরু হয়ে যেতে পারে। ধমনী বা শিরাগুলো উঁচু-নিচু ও অমসৃণ হতে যেতে পারে। রক্তে অধিক পরিমাণ কোলেস্টেরল জমা হলে তা ধমনীর গায়ে আঠার মত লেগে পুরুপ্রলেপ তৈরি করে। এতে ধমনীর রক্ত চলাচল পথ সরু হয়ে রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে। রক্ত অক্সিজেনসরবরাহ করে বলে রক্তবাহী ধমনীতে বাধা সৃষ্টি হলে হৃদপিণ্ডপ্রয়োজনীয় অক্সিজেন পৌঁছায় না। এর ফলে হৃদরোগের সূচনা হয়। এছাড়া হৃদপিণ্ডে কোন কোন মাংসপেশী মরে যেতে পারে, উচ্চ রক্তচাপের কারণে মানুষের হৃদপিণ্ডের ভান্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বৃক্কের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং সর্বপরি, মস্তিষ্কের ধমনী ছিঁড়ে রক্তক্ষরণ হবার সম্ভাবনা থাকে।

দেহে কোলেস্টেরল কমানোর প্রধান দুটি উপায়: i) চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার করা এবং ii) নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস করা।

❏ Angins বলতে কি বুঝায়? Heart Attack ও Stroke এর মধ্যে পার্থক্য কি? Coronary Angiography কি? হৃদরোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত Coronary by-pass ও 'angioplasty'-এর মধ্যে পার্থক্য কি? Pacemaker কি?

(৩১, ৩০, ২৮, ২৩, ২১তম BCS)

Angins: হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে প্রয়োজনের তুলনায় রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ কমে গেলে যে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে Angina Pectoris (অ্যাঞ্জিনা পেকটোরিস) বলে। এই Angina Pectoris রোগটিই সংক্ষেপে Angina (অ্যাঞ্জিনা) বা Angins (অ্যাংজিনস) নামে পরিচিত। এ রোগে আক্রান্ত রোগীর করোনারী ধমনীগুলো (Coronary Arteries) ৫০ থেকে ৭০ শতাংশেরও বেশি পরিমাণে সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে ব্যায়াম ও অন্যান্য শারীরিক পরিশ্রমের সময় যখন হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তখন করোনারী ধমনী প্রয়োজনমতো অক্সিজেন সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে বুকে ভারী ও চাপবোধ অথবা ব্যাথা অনুভূত হয়।

হার্ট অ্যাটাক

হার্ট অ্যাটাক তখন হয় যখন হৃদপিণ্ডের নিজস্ব কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ তথা অক্সিজেন সরবরাহে অসাম্য দেখা দেয়। হার্ট অ্যাটাক (Myocardial infarction) হঠাৎ মৃত্যুর প্রধান কারণ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে যতজন রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয় তার অর্ধেক হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যায়। দশভাগ হাসপাতালে পৌঁছানোর পর মারা যায়। দশ ভাগ মারা যায় পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে। আর দশ ভাগ দশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আমাদের দেশে মৃত্যুর হার আরো বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

লক্ষণ : হার্ট অ্যাটাক সচরাচর হঠাৎ হয়। রোগী শুয়ে, বসে অথবা কাজ করতে করতে হঠাৎ বুকে প্রচুর ব্যাথা অনুভব করে। সঙ্গে প্রচুর ঘাম, শ্বাসকষ্ট, বমিভাব অথবা বমি থাকতে পারে। ব্যাথা এত প্রচুর হয় যে রোগী মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পরে এবং তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তবে বিশভাগ ক্ষেত্রে ব্যাথা ছাড়াও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

❏ কারণ/ ঝুঁকি

৞ বয়স (বেশি বয়স)

৞ পারিবারিক ইতিহাস (পরিবারের অন্য কারো থাকলে)।

৞ ধূমপান।

৞ ডায়াবেটিস।

৞ পুরুষরা অধিক ঝুঁকি আক্রান্ত।

৞ রক্তে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি (কোলেস্টেরল)।

৞ হাইপারটেনশন।

৞ কম শারীরিক শ্রম।

২২ অধিক ওজন।
২২ জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি।

২২ অধিক মদ্যপান।

প্রতিকার- প্রতিকার বলতে উপরে উল্লিখিত ঝুঁকিগুলো কমিয়ে রাখা বোঝায়। তার মধ্যে প্রথম তিনটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বাকীগুলোর মধ্যে ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন, রক্তের চর্বি পরিমাণ, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা। নিয়মিত কিছুটা শারীরিক পরিশ্রম (যেমন ব্যায়াম) করা এবং ওজন কমিয়ে রাখা যেতে পারে।

স্ট্রোক

রক্ত প্রবাহ ব্যাহত হলে মস্তিষ্কে যে অংশে রক্ত প্রবাহ ব্যাহত হয় সেই অংশ শরীরের যে অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে তা দুর্বল অথবা অক্ষম হয়ে যায়। রোগী হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। একে স্ট্রোক বলে।

কারণ- ক. রক্তনালীর রক্ত সরবরাহ করার ক্ষমতা কমে গিয়ে। খ. রক্তনালী ছিঁড়ে গিয়ে।

১ স্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধির কারণ-

১. হাইপারটেনশন;
২. ডায়াবেটিস;
৩. ধূমপান;
৪. রক্তে চর্বি বৃদ্ধি (কোলেস্টেরল);
৫. মদ্যপান;
৬. পরিবারের অন্য কারো হলে;
৭. জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি;
৮. আঘাত

স্ট্রোকের লক্ষণ- সাধারণত রোগী দৈনন্দিন কাজে কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। এই রোগে রোগীর শরীরের কোন এক দিক দুর্বল হয়ে যায়। রোগীর কথা বলায় জড়তা দেখা দিতে পারে।

স্ট্রোকের প্রতিকার- স্ট্রোকের প্রতিকার বলতে উপরে উল্লিখিত ঝুঁকিগুলোকে কমিয়ে রাখা বুঝায়। হাইপারটেনশন ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের রাখার পাশাপাশি ধূমপান বর্জন এবং খাদ্যাভাসে চর্বিজাতীয় খাবার কম রাখা ভাল।

coronary Angiography: Coronary অর্থ ধমনী এবং Angiography অর্থ প্রদর্শনবিদ্যা। অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যার সাহায্যে ধমনীতন্ত্রের প্রদর্শনকে Coronary Angiography বলা হয়। সাধারণত হার্ট এটাক বা স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি অংশের ধমনীর অবস্থা জানতে চিকিৎসকগণ এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।

Coronarybypass: মানবদেহে তিনটি বড় ধমনীসহ আরো কয়েকটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ধমনী দ্বারা হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। যদি কোনো কারণে দুটি বা তিনটি বৃহৎ ধমনী দ্বারাই রক্ত প্রবাহ আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায় তবে সাধারণত যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় তাকে Coronary-by-pass বলা হয়। সাধারণত ধমনীতে চর্বি জমে, রক্ত জমাট বেধে বা ধমনী গাত্র সংকুচিত হয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বা বাধাগ্রস্ত হয়। coronary-by-pass পদ্ধতিতে শরীরের অন্য কোনো স্থান থেকে শিরা কেটে এনে ধমনীর রক্ত চলাচলের বাধা প্রাপ্ত স্থানের ওপর থেকে নিচে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়। এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি তবে এপদ্ধতিটি বেশ জটিল।

Angioplasty: তিনটি বড় ধমনীর মধ্যে যে কোনো একটি ধমনী দ্বারা রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে এর চিকিৎসায় Coronary bypass এর পরিবর্তে অপর একটি পদ্ধতি প্রয়োগে করা হয়, যার নাম Angioplasty। এ পদ্ধতিতে এক বিশেষ ধরনের যন্ত্রের দ্বারা সমস্যায়ুক্ত ধমনীর সংকুচিত স্থান বিশেষ ধরনের বেলুন দ্বারা প্রসারিত করা হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ পদ্ধতিটি Coronary by pass অপেক্ষা সহজতর। তবে এক্ষেত্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তির রক্ত চলাচল পুনরায় বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

Pacemaker: পেসমেকার একটা ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্র। প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ও দেড় ইঞ্চি চওড়া। আর মাত্র এক থেকে দুই মিলিমিটার পুরু। এতে একটা সূক্ষ্ম তার আছে, সেটা একটা রক্তনালীর মধ্য দিয়ে হার্টে চালিয়ে দেয়া হয়। একটা ছোট অপারেশন করে যন্ত্রটা বুকের চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই অপারেশনের মাত্র ৪/৫ দিন পর রোগী বাড়ি ফিরে যেতে পারে। পেসমেকারের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স মস্তিষ্ক আছে যা ওই সূক্ষ্ম তারের মধ্য দিয়ে খবর পায় হার্ট চলছে না থেমে গেছে। হার্টের স্পন্দন থামলেই পেসমেকার বুঝতে পারে হার্টে বিদ্যুৎ সরবরাহে নিশ্চয়ই বিঘ্ন ঘটেছে। তখনই পেসমেকারের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক ঐ তারের মধ্যে দিয়েই প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে পাঠিয়ে দেয়। হার্ট আবার পাম্প করতে আরম্ভ করে। এ ঘটনাগুলো এতো নিমিষে ঘটে যায় যে, হার্ট বন্ধ হয়ে রাক আউট ইত্যাদি সমস্যার সূত্রপাতের কোনো অবকাশ থাকে না।

□ রক্ত কণিকাসমূহ কী কী? রক্ত লাল দেখায় কেন? হেপাটাইটিস কী? কী কারণে হেপাটাইটিস হয়? রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিত দুটি হেপাটাইটিস ভাইরাসের নাম লিখুন। (৪০তম বিসিএস)

রক্তকণিকা : ১. শ্বেত রক্তকণিকা, ২. লোহিত রক্তকণিকা ও ৩. অণুচক্রিকা।

রক্তে হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির কারণে রক্ত লাল দেখায়।

হেপাটাইটিস, এটার কারণ ও বাহক : যকৃতের আরেক নাম হেপাটিকা; যকৃতের প্রদাহ হলো হেপাটাইটিস। ভাইরাস অথবা অ্যান্টিবায়োটিকের আক্রমণে যকৃতের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এ রোগ হয়। আক্রান্ত রোগীর রক্ত ও দেহ রসে এই ভাইরাস পাওয়া যায়। এটি লিভারের মারাত্মক প্রদাহ, লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এর মধ্যেও হেপাটাইটিস-বি অত্যন্ত মারাত্মক। এ রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১ হেপাটাইটিসের কারণ :

(ক) হেপাটাইটিস প্রধানত কয়েকটি প্রজাতির হেপাটাইটিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট যকৃতে ইনফেকশনের কারণে হয়।
(খ) কোন কারণে যকৃতের কোষগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে ভাঙতে থাকলে এ রোগ দেখা দেয়। যেমন- অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক সেবন, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন ও ম্যালেরিয়ার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে যকৃতের কোষগুলো অতিমাত্রায় ভাঙনের ফলে এ রোগ হয়।

(গ) কোন কারণে পিত্তনালী অবরুদ্ধ বা বন্ধ হয়ে গেলেও Obstructive হেপাটাইটিস দেখা দেয়।

রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিত দুটি হেপাটাইটিস ভাইরাস : (i) হেপাটাইটিস 'বি'; (ii) হেপাটাইটিস 'সি'

□ অ্যান্টিসেপটিক কী? চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত তিনটি উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিসেপটিকের নাম লিখুন। (৪০তম বিসিএস)

অ্যান্টিসেপটিক : যে সব বস্তু জীবাণুর বিস্তার ও বৃদ্ধি সীমিত করে অসংক্রামক অবস্থায় রাখে তাদের অ্যান্টিসেপটিক বলে। কোথাও কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে ইনফেকশন প্রতিরোধ করার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহার করা হয়। যেমন : বিটা আয়োডিন, $KMnO_4$.

১ তিনটি উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিসেপটিক হলো :

- ডেটল বা স্যাভলন,
- হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ও
- এন্টিবায়োটিক ক্রিম।

□ উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) কি? উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ, কারণ ও প্রভাবগুলো বর্ণনা করুন। (৩৮, ৩০তম BCS)

উচ্চ রক্তচাপ : উচ্চ রক্তচাপ এক ধরনের রোগ। একজন স্বাভাবিক মানুষের রক্তচাপ ১২০/৮০ এর মধ্যে থাকে। এই রক্তের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি এবং দীর্ঘস্থায়ী হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে ধরা হয়। স্বাভাবিক বিশ্রামের অবস্থায় একজন ব্যক্তির রক্তচাপ যদি স্থায়ীভাবে নিচে ৯০ মিলিমিটার এবং উপরে ১৪০ মিলিমিটার মার্কারী বা তদুর্ধ্বে থাকে তখন তাকে উচ্চরক্তচাপ বলে।

১ লক্ষণ-

- মাথা ব্যাথা, সাথে সাথে কখনো ঘাড়ে ব্যথা।
- অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি, বুক ব্যথা, নিদ্রাহীনতা।
- বুক ধড়ফড় করে এবং ব্যথা হয়।
- সামান্য শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন প্রস্রাব এবং সামান্য কারণে বিরজিতা।
- হঠাৎ করে শরীর ঘাম দিয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়।

কারণ- অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ প্রাথমিকভাবে শুরু হয়। অর্থাৎ এর কারণ অজানা। তবে নিম্নোক্ত কারণগুলো উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

১. জন্মগত -উচ্চরক্তচাপযুক্ত পিতা মাতার সন্তানদের একই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাছাড়া যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করার সময় ওজন কম থাকে। তাদের উচ্চরক্তচাপে ভোগার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

২. পরিবেশগত-

- অতিরিক্ত শারীরিক ওজন;
- বেশিমাাত্রায় মদ্যপান;
- খাদ্যে বেশি লবণ খাওয়ার অভ্যাস;
- কোন বড় অসুখ বা আঘাত যা শরীরের ও মনের চাপ বাড়ায় তা উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে।

৩. এছাড়াও কতগুলি রোগ আছে যা থেকে উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। (Secondary Hypertension) যেমন কিছু কিডনির রোগ, কিছু হরমোন জনিত রোগ এবং কিছু ঔষধ।

প্রতিকার- হাইপারটেনশন যদি প্রাথমিক হয় অর্থাৎ অন্য কোন রোগ বা ঔষধের কারণে না হয়, সেক্ষেত্রে আজীবন ঔষধ গ্রহণের বিকল্প নেই। কিন্তু যদি এর কারণ জানা যায় (যেমন কিডনির রোগ অথবা হরমোনের প্রভাব অথবা ঔষধ) তবে কারণের প্রতিকার করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। খাদ্যাভাসে লবণ ও চর্বি জাতীয় খাবার কম খেয়ে উচ্চরক্তচাপে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

□ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন কি? এটির জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগের নাম লিখুন। (২৭তম BCS)

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardial Infarction): কোনো কারণে হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে যে রোগের সৃষ্টি হয়, তাকে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলে, যা হার্ট অ্যাটাক (Heart attack) নামে পরিচিত। হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে করোনারী ধমনী (Coronary artery)। অনেক সময় এই করোনারী ধমনীর ভিতরের দিকের দেয়ালে কোলেস্টেরল জমা হয়ে রক্ত চলাচলের পথে সরু হয়ে যায় এবং চলাচল বাধা গ্রহণ হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং সৃষ্টি হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগ হলো :

i. উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)।

ii. বহুমূত্র রোগ (Diabetes)।

□ হিমোগ্লোবিন মানবদেহে কোন ভূমিকা পালন করে? (২১ তম BCS)

হিমোগ্লোবিন : লোহিত রক্ত কণিকার সাইটোপ্লাজমস্থ এক ধরনের লৌহঘটিত প্রোটিন জাতীয় রঞ্জক পদার্থ হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। লোহিত রক্ত কণিকার কঠিন পদার্থের প্রায় ৯৫ ভাগই হচ্ছে হিমোগ্লোবিন।

মানবদেহে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা: মানবদেহে হিমোগ্লোবিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর প্রধান কাজ হচ্ছে ফুসফুস হতে কলায় অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যাওয়া ও রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন। হিমোগ্লোবিন সাথে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়া করে যথাক্রমে অক্সি-হিমোগ্লোবিন ও কার্বামাইনেহিমোগ্লোবিন নামে দু'ধরনের অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ দুটো রক্তের সাহায্যে দেহের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। অক্সি-হিমোগ্লোবিনসমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ড হয়ে সারা দেহে বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আর কার্বামাইনেহিমোগ্লোবিনসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুস যায়। উপরোক্ত কাজ ছাড়াও হিমোগ্লোবিন বাফার হিসেবে কাজ করে রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ভেঙ্গে পিণ্ডের প্রধান রঞ্জক সৃষ্টি করে।

□ রক্তচাপ কি? এটা কত প্রকার কি কি? ব্যাখ্যা করুন? রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম লিখুন? (১১তম ও ২তম BCS)

রক্তচাপ: হৃদযন্ত্র থেকে রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনীতে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ দুই ধরনের যথা-
ক) সিস্টোলিক চাপ।

খ) ডায়াস্টোলিক চাপ।

সিস্টোলিক চাপ: হৃদপিণ্ডের সংকোচনকে সিস্টোল বলে। সিস্টোল অবস্থায় ধমনীতে যে চাপ থাকে তাকে সিস্টোলিক চাপ বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় সিস্টোলিক চাপ পারদ স্তম্ভের ১১০-১৩০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। গড়মান পারদ স্তম্ভের ১২০ মিলিমিটার।

ডায়াস্টোলিক চাপ: হৃদযন্ত্রের প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলা হয়। ডায়াস্টোল অবস্থায় ধমনীতে রক্তের চাপকে ডায়াস্টোলিক চাপ বলা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ৭০-৯০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। গড়মান পারদ স্তম্ভের ৮০ মিলিমিটার। একজন পূর্ণ বয়স্ক স্বাভাবিক মানুষের সিস্টোলিক চাপ ১২০ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৮০।

রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম: রক্তচাপ মাপা হয় স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer)।

STUDENT



STUDY

রক্ত, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, উচ্চরক্তচাপ
Heart Attack, Stroke

□ রক্ত কি? রক্তের কাজ কি?

রক্ত: কোষ বহুল, সামান্য লবণাক্ত, ক্ষারধর্মী লাল বর্ণের যে ঘন তরল পদার্থ হৃৎপিণ্ড ধমনী, শিরা ও রক্ত জালকের মধ্যে দিয়ে প্রবাহমান তাকে রক্ত বলে। রক্ত হলো এক ধরনের তরল যোজক কলা।

এটি রক্তরস এবং রক্তকণিকার সমন্বয়ে গঠিত। রক্তের প্রায় ৫৫ শতাংশই রক্তরস এবং ৪৫ শতাংশ রক্ত কণিকা, মানবদেহে এই রক্ত A, B, AB, এবং O এই চারটি গ্রুপে বিভক্ত।

১ রক্তের কাজ-

i) অক্সিজেন পরিবহন; ii) কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহন; iii) খাদ্যরস পরিবহন; iv) হরমোন পরিবহন; v) পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ; vi) দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ; vii) এসিড ক্ষার সাম্যবস্থা; viii) বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশন; ix) প্রোটিন সঞ্চয় ও এলার্জি রোধ।

□ রক্তের উপাদান কি কি? বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন?

রক্ত : দু'প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যথা:

১. রক্তরস (৫৫%) ও ২. রক্তকণিকা (৪৫%)।

১ বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কাজ-

০১. রক্তরস:

গঠন- রক্তরসে ৯০ - ৯২% জলীয় অংশ এবং ৮-১০% বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে গঠিত রক্তরসে তিন প্রকার পদার্থ থাকে। যথা

ক) অজৈব পদার্থ (সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি)

খ) জৈব পদার্থ (শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদি)

গ) গ্যাসীয় পদার্থ (অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি)

কাজ-

i) রক্তরস রক্তকণিকা ধারণ করে। ii) দূষিত পদার্থ অপসারণ করে।

iii) হজমকৃত খাদ্যবস্তু, কার্বন ডাই অক্সাইড ইউরিয়া, হরমোন ইত্যাদি।

iv) পানি ও তাপের সমতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

০২. রক্তকণিকা: মানুষের রক্তে তিন ধরনের রক্তকণিকা থাকে।

ক. লোহিত কণিকা বা এরিথ্রোসাইট।

খ. শ্বেতকণিকা বা লিউকোসাইট।

গ. অণুচক্রিকা বা থ্রোম্বোসাইট।

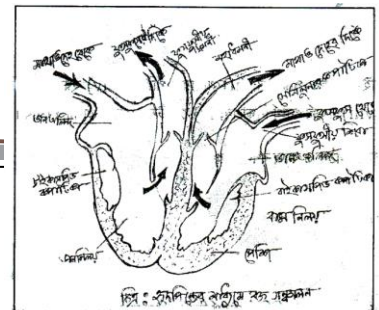
রক্তকণিকা	বৈশিষ্ট্য	কাজ
লোহিত কণিকা	i) নিউক্লিয়াসবিহীন ii) হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে।	i) অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে। ii) অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করে।
শ্বেত কণিকা	i) নিউক্লিয়াসযুক্ত ii) লোহিতকণিকা বড় অপেক্ষা	i) জীবাণু ধ্বংস করে ii) দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে।
অণুচক্রিকা	i) নিউক্লিয়াস থাকে না ii) সবচেয়ে ক্ষুদ্ররক্ত কণিকা	i) রক্ত জমাট বাধতে সহায়তা করে।

□ হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন?

হৃদদেশী দ্বারা তৈরি হৃদযন্ত্র একটি পাম্প যন্ত্র বিশেষ। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে আনিত দূষিত রক্ত ফুসফুসে প্রেরণ এবং বিশুদ্ধ রক্ত ধমনীর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করা এ যন্ত্রের কাজ। হৃদযন্ত্র চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। যথা-

১) ডান অলিন্দ ২) বাম অলিন্দ ৩) ডান নিলয়, ৪) বাম নিলয়।

হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি: অলিন্দ ও নিলয়ের সংকোচন ও প্রসারণের ফলেই হৃদযন্ত্রের রক্তসঞ্চালন সংঘটিত হয়। CO₂ সমৃদ্ধ রক্ত দেহ থেকে উর্ধ্ব ও নিম্ন



মহাশিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে ফুসফুসীয় শিরা পথে বাম অলিন্দে আসে। অলিন্দদ্বয় সংকুচিত হলে রক্ত ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এরপর নিলয় দুইটি সংকুচিত হলে রক্তের চাপে একদিকে বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা দ্বারা বাম ও ডান অলিন্দ নিলয় ছিদ্র পথ বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে ফুসফুসীয় ধমনী মহাধমনীর মুখের অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা খুলে যায়। ফলে বাম নিলয়ের অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত মহাধমনীর মাধ্যমে সারা দেহে এবং ডান নিলয়ের কার্বন ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে যায়। এভাবে হৃদযন্ত্রের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

□ সংজ্ঞা লিখুন ও ধমনী, শিরা, রক্তজালক বা কৈশিক নালী?

ধমনী: ধমনী হৃদপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের সকল অঙ্গে সাধারণত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। এরা দেহের ভেতরের দিকে অবস্থিত। ধমনীর প্রাচীর পুরু এবং ধমনী গহ্বরে কপাটিকা থাকে না।

শিরা: দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে উৎপত্তি হয়ে সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ হৃদযন্ত্রের দিকে পরিবহন করে। শিরার প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং এদের গহ্বরে প্রাচীর গাত্রে কপাটিকা থাকে।

রক্তজালক বা কৈশিক নালী: ধমনী ক্রমান্বয়ে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অতি সূক্ষ্ম নালী তৈরি করে। এ সকল সূক্ষ্ম নালীকে কৈশিক নালী বলে। কৈশিক নালী দেহ কোষের চারপাশে থাকে একটি এবং মাত্র একস্তর কোষ দ্বারা এদের প্রাচীর গঠিত, কৈশিক নালী থেকে শিরার উৎপত্তি।

□ ব্যাখ্যা করুন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ রক্তদান করলে নিজের কোন ক্ষতি হয় না?

রক্তের কোন বিকল্প নেই। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে ৫-৬ লিটারের বেশি রক্তের প্রয়োজন নেই। কোন ব্যক্তি রক্তদান করলে তা ৪ মাসের মধ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। ৪ মাস পর আবার রক্ত না দিলে অতিরিক্ত রক্ত নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। যারা রক্ত দেন না তাদের প্রতিদিন বিশ হাজার লোহিত রক্তকণিকা তৈরি ও ধ্বংস হয়। এভাবে যে কোন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতি চার মাস অন্তর রক্ত দিতে পারে। এতে নিজের কোন ক্ষতি হয় না। অপরদিকে একটি মূল্যবান জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়।

□ ব্লাড ব্যাংক কি?

যে স্থানে 4° সে, থেকে 6° সে, তাপমাত্রায় রক্ত সংরক্ষণ করা হয় তাকে ব্লাড ব্যাংক বলা হয়। সংরক্ষিত রক্ত রোগীর প্রয়োজনে শরীরে প্রবেশ করা হয়।

□ এনজিওগ্রাফি (Angiography) কি? এনজিওগ্রাম পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।

এনজিওগ্রাফি: এনজিওগ্রাফি হলো এমন একটি প্রতিবিম্ব তৈরির পরীক্ষা যেখানে শরীরের রক্তনালিকাসমূহ দেখার জন্য এক্সরে ব্যবহার করা হয়। এ পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তবাহী শিরা বা ধমনীগুলো সরু, ব্লক ও প্রসারিত হয়েছে কি না তা নির্ণয় করা যায়। রক্তনালিতে ব্লক এবং রক্তনালি সরু এবং অপ্রশস্ত হলে শরীরে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়।

এনজিওগ্রাম পদ্ধতি: এনজিওগ্রাম করার সময় চিকিৎসক রোগীর দেহে একটি তরল পদার্থ একটি সরু ও নমনীয় নলের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেন। তরল পদার্থটিকে 'ডাই' এবং নলটিকে ক্যাথেটার বলে। এই ডাই ব্যবহারের ফলে রক্তবাহী নালিকাগুলো এক্সরের সাহায্যে দৃশ্যমান দেখা যায়। এই ডাই পরে কিডনি এবং মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায় একটি নির্দিষ্ট প্রবেশ বিন্দুর মধ্য দিয়ে ক্যাথেটারটিকে নির্দিষ্ট ধমনী বা শিরার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। প্রবেশ বিন্দুটি শরীরের যে কোনো স্থানের রক্তনালিতে হতে পারে। ব্যবহৃত ডাইটিকে কখনো কখনো বৈসাদৃশ্য বা Contrast হিসেবে অভিহিত করা হয়।

BCS প্রশ্নাবলী HIV/AIDS

□ HIV কি? AIDS কি? HIV/AIDS কিভাবে ছড়ায়? এর রোগের আক্রমণের লক্ষণ ও প্রভাব আলোচনা করুন। কিভাবে HIV/AIDS প্রতিরোধ করা সম্ভব? (২৯, ২৭, ২৪, ২৩, ১৫ ও ১০তম BCS)

HIV Human Immunodeficiency Virus' নামটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে HIV। এই ভাইরাস দেখতে গোলাকার। এর অভ্যন্তরে এক সূত্রক RNA বিদ্যমান। এটি এমন এক বিশেষ প্রজাতির ভাইরাস যা শরীরে প্রবেশ করলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

AIDS: AIDS-এর পূর্ণরূপ AcquiredImmuneDeficiencySyndrome। AIDS ভাইরাস একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। HumanImmunodeficiencyVirus (HIV) এ রোগের কারণ। ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম AIDSরোগী সনাক্ত করা হয়। **HIV/AIDS** এর বিস্তার: নিম্নোক্ত উপায়েHIV/AIDS ছড়াতে পারে -

- ক) আক্রান্ত পুরুষ অথবা মহিলা সাথে অরক্ষিত যৌন মিলনের মাধ্যমে।
- খ) আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে গ্রহণের মাধ্যমে।
- গ) আক্রান্ত ব্যক্তির সিরিঞ্জ, রেজার, ব্লেড বা স্কুর জীবাণুমুক্ত না করে পুনরায় ব্যবহার করলে।
- ঘ) আক্রান্ত মা থেকে গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে অথবা বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর শরীরে।

❖ HIV/ AIDS এর লক্ষণ ও ক্ষতিকর প্রভাব:

- ক) মাঝে মাঝে ছোট খাটো জ্বর, মাথাব্যথা ও দৃষ্টি শক্তিহানি।
- খ) গলা, বগল ও কুচকীর ব্যথাহীন গ্রন্থি ফুলে যাওয়া।
- গ) শুকনো কাশি, নিঃশ্বাসে কষ্ট, গলাব্যথা বিশেষ করে খাবার সময়ে।
- ঘ) মুখের ভিতর, জিভে ও ঠোঁটে সাদা পর্দা পড়া।
- ঙ) সীমাহীন দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তিহীনতা।
- চ) অনিদ্রা, রাতে গা ঘামা ও ওজন হ্রাস।
- ছ) হজম শক্তি কমে যাওয়া।
- জ) পিঠে মুখে গলায় ফুসকুরি। চামড়ায় বিভিন্ন স্থানে লালচে দাগ। কোনো ব্যথা নেই কিন্তু ভেতরটা শক্ত এবং দেখতে বিশ্রী।

❖ HIV/AIDS এর প্রতিকার: এ রোগের কোনোপ্রতিকার না থাকলেও এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেমন -

- ক) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
- খ) বহুগামিতা ও পতিতালয়ে যাতায়াত পরিহার করা। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করা।
- গ) রক্ত, রক্তজাত দ্রব্য বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহণের পূর্বে HIV/AIDS পরীক্ষা করে নেয়া।
- ঘ) একবার ব্যবহারযোগ্য সিরিঞ্জ (ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ), নতুন ব্লেড ব্যবহার করা অথবা ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, রেজার, স্কুর জীবাণুমুক্ত করে নেয়া।
- ঙ) এইডস আক্রান্ত মায়ের দ্বারা তার শিশু সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আক্রান্ত হলে গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকা।

BCS প্রশ্নাবলী

ক্যান্সার ও ক্যান্সার চিকিৎসা

❑ কেমোথেরাপি কি? ইহা কেন ব্যবহার করা হয়?

(৩৩ ও ১০তম BCS)

রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে চিকিৎসা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি হল কেমোথেরাপি। এর জনক হলেন জার্মান চিকিৎসক পল এহলিক। সাধারণত জীবাণুর সংক্রমণ এবং ক্যান্সারের জন্য কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ প্রয়োগে ক্যান্সারের চিকিৎসাকে কেমোথেরাপি বলে। ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ যখন দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তখন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব হয় না। এজন্য কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

❑ ব্লাড ক্যান্সার কত প্রকার? এর চিকিৎসা সম্পর্কে লিখুন।

(৩১তম BCS)

ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া, রক্তের একটি অতি মারাত্মক রোগ, যেখানে রক্তকোষের অনিয়ন্ত্রিত এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে, যা অস্থিমজ্জা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিস্তার লাভ করে। আমরা জানি, রক্তে তিন ধরনের কণিকা আছে- লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা। ব্লাড ক্যান্সারে যে কোনো ধরনের কণিকাই আক্রান্ত হতে পারে।

প্রকারভেদ: লিউকোমিয়া সাধারণত দু'ধরনের- একিউট (Acute) ও ক্রনিক (Chronic)। প্রথমটি দ্রুত প্রসারমান এবং সাধারণত ছোটদের বেশি হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি ধীরগতিতে প্রসারমান ও বড়দের বেশি হয়।

কারণসমূহ: ব্লাড ক্যান্সারের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তবে রক্তকোষ বিভাজনের সময় জিনগত ত্রুটি বা Mutation-এর ফলেই ক্যান্সারের উৎপত্তি। এ ত্রুটি বা Mutation-এর জন্য রেডিয়েশন (Radiation), বিভিন্ন কেমিক্যালস (যেমন- বেনজিন), ভাইরাস (যেমন- HTLV) ড্রাগস। ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়ে থাকে।

লক্ষণসমূহ: সাধারণত জ্বর, কাশি, শরীর ব্যথা (বিশেষ করে হাঁড় এবং জয়েন্ট), দুর্বলতা, রক্তক্ষরণ (নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে বা মাসিকের মতো) ইত্যাদি উপসর্গেই রোগীরা ভোগে। অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থিসমূহ ফুলে যেতে পারে, রক্তবমি হয় বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে ও রক্ত যেতে পারে। প্রায় সব রোগীই রক্তশূন্যতায় ভোগে তাই ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করে।

ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসা ও করণীয় ও রক্তের PBHF এবং Bonemarrow পরীক্ষার মাধ্যমে অতি সহজেই ব্লাড ক্যান্সার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে ব্লাড ক্যান্সারের প্রায় সব চিকিৎসা সম্ভব (কেবল বোন ম্যারো প্রতিস্থাপন ছাড়া) এবং অত্যন্ত সফলভাবে চালু আছে। চিকিৎসা সাধারণত দু'ধরনের- ১. ক্যান্সার কোষ নির্মূল করার চিকিৎসা; যেমন- কেমোথেরাপি, অস্ত্রিমজ্জা ও রক্তকোষ প্রতিস্থাপন, ২. উপসর্গসমূহের চিকিৎসা; যেমন- রক্ত পরিস্ফুলন, বিভিন্ন প্রকার ইনফেকশন দূর করা এবং পুষ্টি নিশ্চিত করা।

❑ কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য কাকে বলে? এরা কিভাবে রোগ তৈরি করে? (২৭তম BCS)

কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য (Carcinogenic Chemical Substance): যেসব রাসায়নিক দ্রব্য শরীরে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে তাদেরকে কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য বলে। অ্যাসবেস্টাস (Asbestos), বেনজিন, তামাক ইত্যাদি হলো কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্যের উদাহরণ। কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা শরীরে রোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্যগুলো শরীরে প্রবেশ করে কোষীয় মেটাবলিজম (Metabolism) প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায় অথবা কোষের DNA-কে সরাসরি ধ্বংস করে ফেলে। এর ফলে কোষের জৈব প্রক্রিয়া (Biological Process) প্রভাবিত হয় এবং শুরু হয় অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন। এই অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজনের ফলেই সৃষ্টি হয় ক্যান্সার।

❑ ক্যান্সার কোষের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ কোষের পার্থক্য মূলত কি? (১৩ তম BCS)

ক্যান্সার কোষের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ কোষের পার্থক্য হচ্ছে ক্যান্সার কোষের বিভাজন প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক এবং অনিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে স্বাভাবিক কোষের বিভাজন। প্রক্রিয়া স্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রিত।

STUDENT



STUDY

ক্যান্সার ও ক্যান্সার চিকিৎসা

ক্যান্সার

অপ্রত্যাশিতভাবে দেহের কোনো নির্দিষ্ট অংশের কোষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, দ্রুতহারে, ক্রমাগত বিভাজনের (Cell division) ফলে যে জৈবিক ক্রিয়াকলাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তাকে ক্যান্সার বলে।

❑ রেডিওথেরাপি কি? কয় ধরনের ও কি কি?

রেডিওথেরাপি শব্দটি ইংরেজি 'RadiationTherapy' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ। যেমন-ক্যান্সার, থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক প্রকৃতি, রক্তের কিছু ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় সাধারণত রেডিওথেরাপি উচ্চশক্তিসম্পন্ন এক্সরে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। এটি টিউমার কোষের অভ্যন্তরস্থ ডিএনএ (DNA)-কে ধ্বংসের মাধ্যমে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলে। মূলত এটি হলো কোনোরোগের চিকিৎসায়। আয়নসৃষ্টিকারী (তেজস্ক্রিয়) বিকিরণের ব্যবহার।

রেডিওথেরাপি দুই ধরনের: (১) বাহ্যিক বীম বিকিরণ ও বাহ্যিক রেডিওথেরাপি (২) অভ্যন্তরীণ রেডিওথেরাপি।

BCS প্রশ্নাবলী

রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা

- ❑ রাতকানা রোগ কী? কী কারণে রাতকানা রোগের সৃষ্টি হয় বিস্তারিত আলোচনা করুন। এ রোগ প্রতিকারে কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত? (৪০তম বিসিএস)

রাতকানা : ভিটামিন 'এ' এর অভাবে কেনো ব্যক্তির যখন রেটিনার কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন রোগী দিনের স্বাভাবিক দেখলেও রাতের বেলা ঝাপসা বা খুব কম দেখতে পায়। এ অবস্থাকে রাতকানা বলে।

রাতকানা রোগের সৃষ্টি : আমাদের চোখের রেটিনায় 'রড' এবং 'কোণ' নামে দু'প্রকার আলো গ্রাহক কোষ আছে। 'রড' কোষের সাহায্যে কম আলোর এবং 'কোণ' কোষের সাহায্যে বেশি উজ্জ্বল আলোতে আমরা দেখতে পাই। 'রড' কোষে রডপসিন নামে এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকে। দেহে রেটিনাল জারিত হয়ে রেটিনালে রূপান্তরিত হয়। রেটিনাল অপসিন নামক প্রোটিনের সাথে মিলিত হয়ে রডপসিন তৈরি করে। রডপসিন অস্থায়ী পদার্থ। যখন চোখে আলো পড়ে রডপসিন ভেঙ্গে রেটিনাল ও অপসিন হয় তখন আমরা দেখতে পাই। আমাদের চোখে অনবরত রডপসিন তৈরি হচ্ছে এবং ভাঙছে। এই ভাঙ্গা গড়ার হার যখন সমান হয় তখন আমরা ভাল দেখতে পাই। দেহে ভিটামিন-এ এর অভাবে রডপসিন পুনঃগঠনে ব্যাঘাত ঘটে ও স্বল্প আলোতে দেখা যায় না। এ কারণে রাতকানা রোগের সৃষ্টি হয়।

রাতকানা রোগের প্রতিকার : ১. অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণ না করা; ২. ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা, যেমন- কডলিভার ওয়েল, দুধ, গাজর ইত্যাদি; ৩. এন্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ উদ্ভিজ্জ উৎসকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

- ❑ ডেঙ্গু জ্বরের কারণ ও লক্ষণসমূহ লিখুন। ডেঙ্গু ভাইরাসের জেনেটিক উপাদানটি লিখুন। (৪০তম বিসিএস)

ডেঙ্গু জ্বরের কারণ : এডিস মশার কামড়ে প্রাণীদেহের রক্তে অণুচক্রিকা ভেঙ্গে যায় এবং ডেঙ্গু জ্বরের সৃষ্টি হয়।

➤ ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহ :

- হঠাৎ উচ্চ তাপমাত্রার (40°C) দ্বিস্তরের (Biphasic) জ্বর হয়ে থাকে।
- মাংসপেশীর মারাত্মক ব্যথা অনুভূত হয়ে থাকে, এ জন্য ডেঙ্গুকে ব্রেকবোন ফিভারও বলা হয়ে থাকে।
- খুব মাথা ব্যথা হবে।
- আপার রেসপিরেটরি সিম্পটম তথা হাচি, কাশি ইত্যাদি হতে পারে।

জ্বর কয়েকদিন পর স্বল্প সময়ের বিরতিতে আবার দেখা দেয়। এই সময়ে ৩য় থেকে ৫ম দিনের মধ্যে এক ধরনের লালচে রেশ (Maculopapular) প্রথমে শরীরে, পরে হাত-পা ও মুখে ছড়িয়ে পড়ে। রেশ দেখা দেয়ার কয়েকদিনের মধ্যে জ্বর প্রবল হয় এবং রোগী ক্রমে মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হয়। রোগীর বমি বমি ভাব, চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ, কালো রঙের পায়খানা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

- ❑ ডেঙ্গু ভাইরাসের বিস্তার রোধে আমাদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর নয় কেন? (৪০তম বিসিএস)

ডেঙ্গু ভাইরাসের বিস্তার রোধে করণীয় : ১. মশার বৃদ্ধি রোধ করা; ২. মশা নিধন করা; ৩. ডেঙ্গুবাহী মশার কামড় হ্রাস করা ও ৪. মশারি টানিয়ে ঘুমানো।

ডেঙ্গু জ্বরে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করলে রক্তে প্লাটিলেট ভীষণ হ্রাস পায় এবং রক্ত জমাট বাঁধার আশঙ্কা থাকে। রক্তে প্লাটিলেট ট্রান্সফিউশনের সাম্যতা নষ্ট হয় বলে অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর নয়।

- ❑ রোগ নির্ণয়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ৪ টি গুরুত্ব আলোচনা করুন। (৩৮তম বিসিএস)

আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে শরীরের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাংসপেশি ইত্যাদির ছবি তোলা হয়। এটি করার জন্য খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করে তার প্রতিধ্বনিকে ব্যবহার করা হয়। শব্দের কম্পাঙ্ক ১-১০ মেগাহার্টজ হয়ে থাকে বলে একে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বলা হয়ে থাকে।

গুরুত্ব :

- আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার স্ত্রীরোগ এবং প্রসূতিবিজ্ঞানে। এর সাহায্যে ভ্রূণের আকার গঠন, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থান জানা যায়, প্রসূতি বিজ্ঞানে এটি একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।
- আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে জরায়ুর টিউমার এবং অন্যান্য পেলভিক উপস্থিতিও শনাক্ত করা যায়।

৩. পিত্তপাথর, হৃদযন্ত্রের ক্রটি এবং টিউমার বের করার জন্যও আলট্রাসোনোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করার জন্য যখন আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয়, তখন এই পরীক্ষাকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি বলে।
৪. এক্স-রে'র তুলনায় আলট্রাসোনোগ্রাফি অনেক বেশি নিরাপদ, তবুও এটাকে ঢালাওভাবে ব্যবহার না করে সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সডিউসারটি যেন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বেশি সময়ের জন্য একটানা বিম না পাঠায় সেজন্য আলট্রাসাউন্ড করার সময় ট্রান্সডিউসারটিকে ক্রমাগত নড়াচড়া করতে হয়।

□ ডেঙ্গু হিমোরাজিক ফিভার এর লক্ষণসমূহ কি কি? এর চিকিৎসা উল্লেখ করুন।

(৩৪তম বিসিএস)

ডেঙ্গু হিমোরাজিক ফিভার এর লক্ষণসমূহ-

০১. রোগীর তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়।
০২. ৩-৭ দিনের মধ্যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে জটিলতা দেখা যায় অথবা বিকল হয়ে পড়ে।
০৩. রক্তনালীতে চামড়ার নিচে রক্ত জমাট বাঁধে।
০৪. দাঁতের গোড়া দিয়ে অথবা দেহের যে কোনো স্থান দিয়ে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয়।
০৫. রক্তবমি হয় ও মলদ্বার দিয়ে রক্ত যায়।
০৬. মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের মত রক্তক্ষরণ হয়।
০৭. লিভার বড় হয়ে, পেট বা ফুসফুসে পানি জমতে পারে।
০৮. এছাড়াও সাধারণ ডেঙ্গুজমাট উপসর্গগুলো দেখা যায়।

চিকিৎসা: রক্তক্ষরণ, রক্তজমাট বাঁধা, রক্ত সংবহনতন্ত্রের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট এক জটিল অবস্থার জন্য রোগীকে হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভর্তি করতে হয়।

□ Anthrax কি? এ রোগের উৎস, বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

(৩০তম বিসিএস)

অ্যানথ্রাক্স: অ্যানথ্রাক্স এক ধরনের জীবাণু। এটি মূলত বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়া *Bacillus Anthracis*। এরা দেখতে দন্ডাকার ও গ্রাম পজিটিভ (+ve) ব্যাকটেরিয়া। জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কচ (Koch) এটি আবিষ্কার করেন।

এশিয়ার কিছু অংশ, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় জীবজন্তুদের এই রোগ হয়। ১৯৪০ সালে ব্রিটেন প্রথম জীবাণু অস্ত্র হিসেবে অ্যানথ্রাক্সের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। ১৯৫০ ও ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সামরিক বাহিনীতে অ্যানথ্রাক্স ব্যবহার শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অ্যানথ্রাক্স মূলত পশুপাখির একটি রোগ। মানুষের শরীরে এ রোগ সংক্রমণের ঘটনা বিরল। দীর্ঘ সময়ে নিজে থেকেই জীবাণুটি জন্মলাভ করে। পরিবেশে এই জীবাণু বেঁচে থাকে দীর্ঘদিন। যে সব পশু ঘাস-পাতা খেয়ে বাঁচে তারাই এ জীবাণুতে বেশি আক্রান্ত হয়। কারণ, মাটিতে ঘাসের সাথে এ জীবাণু আটকে থাকে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের পাবনা ও সিরাজগঞ্জ এলাকায় এ রোগের প্রকোপ দেখা দেয়।

বিস্তার: সাধারণত অতিথি পাখির মাধ্যমে এটি মানুষের সন্নিহনে আসে। অ্যানথ্রাক্স জীবাণুতে সংক্রমিত পশুপাখি কিংবা তাদের মাংস দ্বারা প্রস্তুত কোন খাবার থেকে মানুষের মধ্যে এই রোগ দেখা দিতে পারে। ত্বকের সংস্পর্শেও হতে পারে অ্যানথ্রাক্স। বিরল প্রজাতির পশুপাখির মাংস খাওয়া থেকেও অ্যানথ্রাক্স রোগ হয়। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমেও অ্যানথ্রাক্স ছড়ায়।

অ্যানথ্রাক্স এর প্রকারভেদ: কিউটেনিয়াস, গ্যাস্ট্রো ইনটেসটিনাল ও পালমোনারী ইনহ্যালেশন-এই তিন ধরনের অ্যানথ্রাক্স রয়েছে।

অ্যানথ্রাক্স এর লক্ষণ: ত্বকে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমিত হলে শরীরে দু'একদিন পর ছোট দানা দানা গুটি দেখা দেয়। এরপর স্থানটি কালো হলে যায়। আন্ত্রিক সংক্রমণে ক্ষুধামন্দা ও বমি বমি ভাব দেখা দেয়। একই সঙ্গে প্রচুর পেট ব্যথা হয়। রক্তবমিও হতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসে সংক্রমিত অ্যানথ্রাক্সে প্রথম অবস্থায় জ্বর, গায়ে ব্যথা, সর্দিকাশি দেখা দেয়। চিকিৎসা না হলে দু'এক সপ্তাহে তীব্র শ্বাসকষ্ট হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগী মারা যায়।

অ্যানথ্রাক্স এর প্রভাব: মানুষের শরীরে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু প্রবেশ করামাত্রই তা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই শরীরে অ্যানথ্রাক্স টক্সিনের জন্ম দেয়। সাধারণত ৬ দিনের মধ্যে রোগ চরমে পৌঁছে। পালমোনারী অ্যানথ্রাক্সের ক্ষেত্রে সাধারণ সময়সীমা ৬০ দিন। এটাই সবচেয়ে মারাত্মক। আক্রান্ত হওয়ার ২ দিনের মধ্যে ব্যক্তি মারা যায়। চরম পর্যায়ে ১০৩-১০৪ ডিগ্রী পর্যন্ত জ্বর হয়। বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ভয়ংকর আকার ধারণ করে। গ্যাস্ট্রো ইনটেসটিনাল অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত ২৫ শতাংশ রোগী মারা যায়। এক্ষেত্রে জ্বর, রক্ত বমি ও তলপেটে ব্যথা লক্ষণ হিসেবে দেখা দেয়। কিউটেনিয়াস অ্যানথ্রাক্স সবচেয়ে কম ক্ষতিকর। সময়মত অ্যান্টিবায়োটিক খেলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা যায়। অ্যানথ্রাক্স টক্সিন এতই ভয়াবহ যে, জীবাণুর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনার পরও তা ক্ষতি করতে পারে। অ্যানথ্রাক্স ব্যাকটেরিয়া এতটাই বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে যে সেটা রক্তে মিশে রক্তক্ষরণ ঘটায় এবং টিস্যু খসে পড়ে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা: সাবধানতাই এর প্রধান প্রতিরোধক। এছাড়া নাকে মুখে মুখোশ ব্যবহারের মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা যায়। অ্যানথ্রাক্স সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিক জীবাণু সংক্রমণ পরীক্ষা করতে হবে এবং দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসা হিসেবে এন্টিবায়োটিক ডক্সিসাইক্লিন ও সিম্প্রো (সিম্প্রোফ্লোক্সেসিন) গ্রহণ করা যেতে পারে। শরীরে দীর্ঘ সময় এই জীবাণু থাকে বলে ৬০ দিন এন্টিবায়োটিক চিকিৎসা নিতে হয়। তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জীবাণু সন্ত্রাসের অস্ত্র হিসেবে অ্যানথ্রাক্স: অ্যানথ্রাক্সকে জীবাণু সন্ত্রাসের জন্য যথার্থ বলে চিহ্নিত করা হয়। এর প্রধান কারণ হলো এটি ছোঁয়াচে নয়। উপরন্তু এই জীবাণু দীর্ঘ সময় সক্রিয় থাকতে পারে। ১৯৪০ সালে ব্রিটেন প্রথম জীবাণু অস্ত্র হিসাবে অ্যানথ্রাক্সের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিচালিত এমন একটি জীবাণু হামলা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দীর্ঘ ৪২ বছর সে জীবাণু বেঁচে ছিল।

□ হেপাটাইটিস কি? এটি কি কারণে হয়? এর জন্য দায়ী জীবাণু কতরকমের হয় কোন জীবাণুগুলো রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়?

(৩০ ও ২৭তম BCS)

হেপাটাইটিস: যকৃতের আরেক নাম হেপাটিকা; যকৃতের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। ভাইরাস অথবা অ্যান্টিবায়োটিকের আক্রমণে যকৃতের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে হেপাটাইটিস বলে। হেপাটাইটিস-সি অত্যন্ত মারাত্মক। এ রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

হেপাটাইটিসের কারণ: হেপাটাইটিস প্রধানত কয়েকটি প্রজাতির হেপাটাইটিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টিকৃত (Liver) ইনফেকশনের কারণে হয়ে থাকে আবার কোনো কারণে যকৃতের কোষগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে ভাঙতে থাকলে হেপাটাইটিস দেখা দেয়। যেমন- অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক সেবন, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন ও ম্যালেরিয়া জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে যকৃতের কোষগুলোর অতিমাত্রায় ভাঙনের ফলে হেপাটাইটিস সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কোনো কারণে পিণ্ডনালী অবরুদ্ধ বা বন্ধ হয়ে গেলেও অবস্ট্রাকটিভ (Obstructive) হেপাটাইটিস দেখা দেয়।

হেপাটাইটিসের জন্য দায়ী জীবাণু: হেপাটাইটিস প্রধানত পাঁচ প্রকারের হেপাটাইটিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যথা- হেপাটাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, হেপাটাইটিস-ডি ও হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস। এছাড়াও সাইটোমোলো ভাইরাস ও হার্পিস ভাইরাসের কারণেও হেপাটাইটিস হয়ে থাকে।

▣ হেপাটাইটিসের জীবাণু সংক্রমণ:

ক) রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিত হেপাটাইটিস ভাইরাস হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়

খ) খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রমিত হেপাটাইটিস ভাইরাস হেপাটাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস খাবার ও পানির মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়।

□ খাবার স্যালাইনে ব্যবহৃত চিনি/গুড়া ও লবণের প্রয়োজন কি?

(২৭তম BCS)

কোনো ব্যক্তি ডায়রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে তার শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও বিভিন্ন ধরনের লবণ বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে লবণ ও পানির অভাব দেখা দেয় এবং শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। লবণের এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য খাবার স্যালাইনে ধাতব লবণ ব্যবহৃত হয়। আবার চিনি ও গুড় হচ্ছে কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাবার, যা দেহে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। যেহেতু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, সেজন্য তার শরীরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য চিনি বা গুড়খাবার স্যালাইনের সাথে ব্যবহৃত হয়।

□ ডেঙ্গুরোগে রক্তের কোন কণিকা ভেঙে যায়? এই রোগ কিভাবে বাহিত হয়?

(২৫তম BCS)

ডেঙ্গু এডিস মশাবাহিত একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমণে মানবদেহের রক্তের প্লেটিলেটের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। বিশেষ করে হেমোরাজিক ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত ক্ষরণ হয় এবং রক্তের প্লেটিলেট দ্রুত হ্রাস পায়। এতে আক্রান্তরোগীর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উল্লেখ্য মানবদেহের রক্তে প্রতি কিউবিক মিলি মিটারে প্লেটিলেটের স্বাভাবিক পরিমাণ হল দেড় লক্ষ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ।

জীবাণু বহনকারী মশার নাম: এডিস।

প্রকারভেদ: ক্লিনিক্যাল ও হেমোরাজিক।

এডিস মশা কোথায় জন্মায়: ফুলের টব, ভাঙ্গা হাঁড়ি-পাতিল, গাড়ির টায়ার ইত্যাদির মধ্যে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা জন্মায়।

ডেঙ্গু জ্বরের বিস্তার: ডেঙ্গু ফিভার বা জ্বর এক ধরনের ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। শারীরিক দুর্বলতা, ফুসকুড়ি ও লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া এ রোগের উপসর্গ। এডিস ইজিপটি নামক মশা এ ভাইরাসের বাহক। এ মশার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা সাধারণত দিনের বেলা কম আলোতে মানুষকে কামড়ায়, গরমকালে শহর এলাকায় জলাবদ্ধ স্থানে এরা বংশবিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে গরমকালেই এদের বংশবিস্তার বেশি হয়ে থাকে। এ ভাইরাসকে ডেঙ্গু ভাইরাসও বলা হয়। ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী মশা, যাদেরকে কামড়ায় তারাই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। এছাড়াও এ মশা কোনো আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ানোর পরে কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তিও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। তাই বলা যায়, ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিও এ রোগ ছড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

□ ডায়রিয়া হলে যে লবণ গুড়ের শরবত খাওয়ানো হয়, তাতে লবণ ও গুড়ের (অথবা চিনির) ভূমিকা কি? (১৩তম BCS)

লবণ গুড়ের শরবতে বিদ্যমান লবণ রক্তে প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ ধরে রাখে। অপরদিকে গুড় বা চিনি রক্তে শর্করার সরবরাহ নিশ্চিত করে, যা পরবর্তীতে দহনের ফলে শক্তিতে পরিণত হয়ে মানবদেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।

□ কি ত্রুটির জন্য বহুমূত্র রোগ হয়?

ডায়াবেটিস: রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ীভাবে বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় ডায়াবেটিস। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি হলে তা প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে আসে। এই রোগ বংশগত বা পরিবেশগত কারণে হতে পারে। ডায়াবেটিস একটি বিপাকজনিত রোগ।

কারণ: অগ্নাশয়ে আইলেটস অব ল্যাঙ্গার হ্যান্স থেকে নিঃসৃত ইনসুলিন নামক হরমোন গ্লুকোজের পরিমাণ সাম্য মাত্রায় ধরে রাখে। কোন কারণে এই অতীব প্রয়োজনীয় ইনসুলিন পরিমিত মাত্রায় নিঃসৃত না হলে বা একেবারেই নিঃসৃত না হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ক্রমাগত হারে বাড়তে থাকে। ফলে ঘন-ঘন প্রস্রাব, সীমাহীন দুর্বলতা, অধিক ও ঘন ঘন খাবার ইচ্ছাসহ যে রোগটির জন্ম হয় সেটিই বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস।

লক্ষণ: ডায়াবেটিস হলে সাধারণত নিচের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। যথা-

১. অধিক পিপাসা ও অতিরিক্ত ক্ষুধা পায়।
২. অত্যধিক দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ।
৩. শরীরের ওজন কমে যায়।
৪. বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ হয় এবং যা তাড়াতাড়ি শুকায় না।
৫. চোখে ঝাপসা দেখে।

প্রভাব: 'ডায়াবেটিস' অনিয়ন্ত্রিত থাকলে হৃদরোগ, চক্ষু রোগ, পক্ষাঘাত, পায়ের পেশীতে খিল, মূত্র গ্রন্থীর প্রদাহ, চুলকানি, ফোড়া, পাঁচড়া, যক্ষ্মা, ডায়েরিয়া ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত মহিলা ডায়াবেটিস রোগী মৃত সন্তানের জন্ম দান, অকালে সন্তান প্রসব, বেশি ওজনের শিশুর জন্ম দিয়ে থাকেন। অনেক সময় জন্মের পরই শিশুর মৃত্যু হয়। এছাড়াও শিশুর মধ্যে জন্মত্রুটি থাকতে পারে।

চিকিৎসা: ডায়াবেটিস নিরাময় করা যায় না কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রোগ-নিয়ন্ত্রণে থাকলে স্বাভাবিক জীবন যাপনও করা যায়। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত ওষুধ ও ব্যায়াম এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। এছাড়াও শরীরের ওজন ও রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখলে ও ধূমপান না করলে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তেমন জটিলতা দেখা যায় না।

□ বাতজ্বরের লক্ষণ কি? (১১তম BCS)

এটি এক ধরনের রোগ বা অল্প বয়স্কদের বেশী দেখা যায়। আক্রান্তরোগীর ঘন-ঘন জ্বর হয়, খাওয়ায় অরুচি হয়। পায়ের হাটু সংলগ্ন জয়েন্ট ফুলে যায় এবং প্রদাহের সৃষ্টি হয়। হৃদপিণ্ডে প্রদাহ হতে পারে।

CLASS WORK

রোগ-ব্যাদি ও চিকিৎসা

☑ ডেঙ্গু

☑ হেপাটাইটিস

☑ হেপাটাইটিস ডায়াবেটিস

☑ জলাতঙ্ক

☑ বার্ড ফ্লু

☑ সোয়াইন ফ্লু

☑ প্লেগ

☑ Anthrax

প্লেগ

কারণ: ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে প্লেগ রোগটি হয়।

উৎপত্তি: পঞ্চম শতাব্দীতে প্লেগের আক্রমণে বহু লোক মারা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে এ ভয়ংকর জীবাণুর আক্রমণে ইউরোপের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। তবে জীবাণু অস্ত্র হিসেবে এখনও কেউ এটা ব্যবহার করেনি। ১৯৭০ সালে এক পরিসংখ্যানে জাতিসংঘ দেখিয়েছে, বাতাসে ৫০ কিলোগ্রাম প্লেগ জীবাণু ছেড়ে দিলে ন্যূনতম দেড় লাখ লোক আক্রান্ত হবে এবং নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে ৩৬ হাজার মানুষ।

প্রতিক্রিয়া: অ্যানথ্রাক্সের মত প্লেগও তিন ধরনের বিউবোনিক, নিউমোনিক ও সেপ্টেমিক। ২ থেকে ১০ দিনের মধ্যে বিউবোনিক প্লেগের লক্ষণ পরিষ্কার হয়। প্রচুর জ্বরের সাথে বিভিন্ন গ্রন্থিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে নিউমোনিক প্লেগের লক্ষণগুলো ফুটে উঠে। কাশি, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে প্রচুর জ্বর হয়। এটা সহজেই একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। আক্রান্ত হওয়ার ২/৩ দিন পরিয়ে গেলে কোন ঔষুধই রোগিকে বাঁচাতে পারে না। সেপ্টেমিক প্লেগে উপরের দু'ধরনের লক্ষণগুলো দেখা দেয়।

প্রতিরোধ: কিছু ঔষধ আছে। তবে প্লেগের ধরন ও আক্রমণের কেন্দ্রস্থল খুব দ্রুত নির্ধারণ করতে না পারলে ঔষুধে কোন কাজ হয় না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza) এমন একটি রোগ যা সচরাচর ঘটে। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস (Virus)- এর আক্রমণে এই রোগের সৃষ্টি হয়। এটি প্রচুর রকম সংক্রামক ব্যাধি এবং দ্রুত এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়। যখন একই এলাকায় বহু লোক এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন একে ইনফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিক (epidemic) বা মহামারী বলা হয়। তিন ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সৃষ্টি হয়। এদের A, B এবং C গ্রুপের ভাইরাসের আক্রমণ ঘটলে এই রোগ ২ থেকে ৩ বৎসর অন্তর অন্তর আবার ঘটতে পারে। B গ্রুপের আক্রমণে ৪ থেকে ৫ বৎসর অন্তর অন্তর পুনরায় ঘটতে পারে। সকল বয়সের ব্যক্তিকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ আক্রমণ করতে পারে। শীতকালে এর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। কাশি ও সর্দি নির্গমনের ফলে এই রোগ এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির শরীরে সংক্রমিত হয়। নাক এবং গলার ভিতর ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসগুলি তাদের বাসস্থান তৈরী করে। এর ফলে সর্দি, কাশি এবং গলদাহ এবং গলায় যন্ত্রণা হয়। তার ফলে জ্বর, হঠাৎ ঠান্ডা লাগা এবং মাথাধরা ঘটে। অনেক সময়রোগীর শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জা তিনদিন থেকে এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। এই রোগের ফলে মৃত্যুর ঘটনা সাধারণত কম এবং যারা মারা যায় তারা নিউমোনিয়া (pneumonia) প্রভৃতি অন্যান্য জটিলতার ফলে মারা যায়।

নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের রোগ যা সাধারণত মাইক্রো-অর্গানিজম (micro-organism) বা সূক্ষ্ম জীবাণু থেকে জন্মায় যেমন, নিউমোকোকাস (pneumococcus) এবং মাইকোপ্লাজমা (mycoplasma)। রেডিয়েশনের (radiation) বা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গদ্বারা সঞ্চারিত শক্তির প্রভাবাধীন হওয়ার ফলে যেমন- এক্স-রে (X-ray) বা রঞ্জন রশ্মি- অথবা রাসায়নিক ধোঁয়া বা পাউডার নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করার ফলে নিউমোনিয়া হতে পারে। এই রোগের আক্রমণের ফলে ফুসফুসের থলিতে অস্বস্তিকর যন্ত্রণা হয়। এই অবস্থায় সংক্রামকতা প্রতিরোধ করার জন্য শরীর থেকে তরল পদার্থ এবং সাদা রক্তকোষ প্রবাহিত হয়। নিউমোনিয়ার লক্ষণের মধ্যে আছে শৈত্যানুভূতি, জ্বরের আক্রমণ, বুক ব্যথা, কাশি এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টানুভব। রোগ সংক্রমণগ্রস্ত ব্যক্তি বার বার কাশতে কাশতে লোহার মরিচার মত রঙের ফ্লোম-মিউকাস উদগীরণ করেন। ফ্লোম-মিউকাসে যন্ত্রণাগ্রস্ত ফুসফুসের টিস্যুর রক্ত থাকে। এই লক্ষণ এক সপ্তাহ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত থাকে। তারপর শরীরের আত্মরক্ষামূলক যান্ত্রিক ব্যবস্থা রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু করে। এই রোগ দূরীকরণের

উপায়ের মধ্যে আছে। অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ নিউমোনিয়ার আক্রমণের ফলে মৃত্যুর ঘটনা হ্রাস করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

মেনিনজাইটিস

মেনিনজাইটিস (meningitis) একটি মারাত্মক ব্যাধি। মেনিনজেস (meninges) নামীয় যে ঝিল্লী মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডকে আবৃত করে রাখে তার প্রদাহের ফলে এই রোগ সৃষ্টি হয়। যদি এই রোগের সঠিক চিকিৎসা না হয় তাহলে মৃত্যু ঘটে। এই রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা করা দরকার। নিসেরিয়া মেনিনজাইটিডিস (Neisseria Meningitidis) নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের ফলে মেনিনজাইটিস রোগ হয়। ইহা মহামারীর আকারে বিস্তার লাভ করে। কতকগুলি গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে ১০ থেকে ১২ বৎসর অন্তর অন্তর এই রোগ বিস্তার লাভ করে এবং চার থেকে পাঁচ বৎসর স্থায়ী হয়। এই রোগ সাধারণত শিশুদের আক্রমণ করে বিশেষভাবে যে সব শিশুর বয়স পাঁচ বৎসর থেকে কম। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই রোগ যে কোন ব্যক্তিকেই আক্রমণ করতে পারে। গ্রীষ্ম ঋতুতে এই রোগ খুব কম বিস্তার লাভ করে কিন্তু শীতের শেষে অথবা বসন্ত ঋতুতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। নোংরা পরিবেশে যে সমস্তলোক বাস করে বিশেষ করে তাদেরই এই রোগে আক্রমণ করে।

আমাশয়

অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা নামক এক প্রকার প্রোটোজোয়ার আক্রমণে আমাদের অন্ত্রে আমাশয়রোগ হয়। আমাশয় হলে পেটে প্রচুর ব্যথা হয়, পাতলা শ্লেষ্মা আমযুক্ত পায়খানা হয়। নাভির চারিদিকে ব্যথা, প্রস্রাবে কষ্ট, আমযুক্ত রক্ত, মুখলাল, আনাড়বাহ্য, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং মল ত্যাগের পর পুনরায় মলত্যাগ হবে বলে বসে থাকা, মলে দুর্গন্ধ, অনেক সময় জ্বর জ্বর ভাব থাকা এবং মল ত্যাগের পর ব্যথা কমে গিয়ে পুনরায় বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। আমাশয়রোগে দীর্ঘ দিন ভুগলে Liver Abscess অথবা Hepatitis রোগ হতে পারে।

অ্যামিবিবিক আমাশয়: প্রধানত এন্টামিবা নামক একপ্রকার এককোষী প্রাণী মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করলে এ ধরনের আমাশয়রোগ হয়।

ব্যাসিলারী আমাশয়: শিগেলা নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অন্ত্র আক্রান্ত হলে এ ধরনের আমাশয় হয়। জীবাণু বৃহদান্ত্রের ঝিল্লীকে আক্রমণ করে। ফলে বারবার পায়খানা হয় এবং পায়খানার সাথে শ্লেষ্মা বের হয়। অনেক সময় রক্তও যায়। এ জন্য এ রোগকে রক্তআমাশয় বলে। আমাশয়রোগ হলে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সাধারণত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

যক্ষ্মা

টিউবারকুলাস ব্যাসিলাস দ্বারা আক্রান্ত হলে যক্ষ্মারোগ হয়। এটিও একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, অপুষ্টির ও অপরিষ্কার খাদ্যগ্রহণ এবং অধিক পরিশ্রমে এ রোগ হয়। এই রোগে বিকালের দিকে সামান্য জ্বর, কাশি, কাশির সাথে রক্ত, ওজন কমা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। ডাক্তারের পরামর্শে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঔষধ সেবন ও বিশ্রাম নিলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক শিশুকে বি.সি.জি. টিকা দেওয়া উচিত। রোগীর কফের সাথে এই রোগ ছড়ায়।

ব্রঙ্কাইটিস: শ্বাসনালীর ভেতরে আবৃত ঝিল্লীর প্রদাহের কারণে এ রোগ হয়। ধূমপানেও এ রোগ হয়। জ্বর, খুসখুসে কাশি ও শ্বাসকষ্ট এ রোগের লক্ষণ।

কলেরা

ভিব্রিও কলেরি নামে পরিচিত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অন্ত্রে সংক্রমিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট রোগ। এ রোগের প্রধান উপসর্গ মারাত্মক ডায়রিয়া। এক হিসাবে দেখা যায়। প্রতি বছর ডায়রিয়ার কারণে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এদের অধিকাংশই শিশু এবং এ সকল ডায়রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ কলেরা। উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে অবশ্য কলেরার মৃত্যুহার ১% এরও কম। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আগে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অধিকাংশ রোগী মারা যেত। এখন পরিস্থিতি অনেক উন্নত হয়েছে। বিশেষত খাবার স্যালাইন বা লবণ-গুড়-পানির শরবত ডায়রিয়ার চিকিৎসায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, পরজীবীঘটিত সংক্রামক একটি রোগ। প্লাজমোডিয়াম প্রজাতির পরজীবিবাহক অ্যানোফিলিস জাতীয় মশার দংশনে মানুষের রক্তে উক্ত পরজীবির সংক্রমণ ঘটে। ফলে মানবদেহে ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দেয়। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগীর গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে এবং এক পর্যায়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। এক ধরনের ম্যালেরিয়ার ৪৮ ঘন্টা পরপর জ্বর আসে এবং আরেক ধরনের ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে জ্বর আসে ৭২ ঘন্টা পরপর ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মাথাধরা, পেশিতে ব্যথা, যকৃৎ ও প্লীহার আকার বৃদ্ধি, রক্তপাত ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জন্য কুইনাইন বা ক্লোরোকুইন, প্রিমািকুইন, এমোডিয়াকুইন, পাইরিমেথামাইল, ক্লোরোয়ানাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

কালাজ্বর

কালাজ্বর প্রধানত উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকার রোগ লিশমেনিয়া ডনোভানি নামক পরজীবী এই রোগের কারণ। পরজীবিবাহী ফ্লেবোটোমাস জাতের মাছির দংশনে এই রোগ বিস্তারলাভ করে। কালাজ্বরে আক্রান্তরোগীর মল, মূত্র এবং নাসিকায় নিঃসরণের মাধ্যমে সুস্থ শরীরে কালাজ্বরের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। কালাজ্বরে আক্রান্ত কুকুর, শেয়াল এবং অন্যান্য প্রাণীর কামড়েও মানবদেহে কালাজ্বরের বিস্তার ঘটতে দেখা যায়। এই রোগের প্রধান লক্ষণ জ্বর; সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান রক্তহীনতা। তা ছাড়া এই রোগে রোগীর প্লীহা ও যকৃতের আকার বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসা না করানো হলে রক্তহীনতা, ওজন হ্রাস ও অন্যান্য উপসর্গ রোগীর মৃত্যু ঘটে। কালাজ্বরের চিকিৎসায় সোডিয়াম স্টিবো-গু-কোনেট জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রথম কালাজ্বরের ঔষধ ইউরিয়া স্টিবামিন ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করেন।

মাথাব্যথা

আমাদের শরীরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কের আবরণকে খুলি বলে। এই খুলিতে অসংখ্য শিরা এবং ধমনী থাকে। যেগুলি ব্যথায় সংবেদনশীল। তাছাড়া মস্তিষ্কের চতুর্দিকে অসংখ্য গ্রন্থি থাকে যেগুলি ব্যথায় সংবেদনশীল। কোনো কারণে এসব শিরা, ধমনী বা গ্রন্থি সকল আঘাত প্রাপ্ত হয়। তখনই আমরা ব্যথা অনুভব করি। আমাদের মস্তিষ্কের শিরা এবং ধমনী গুলি বিভিন্ন কারণে আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে, যেমন চোখ, নাক, দাঁত প্রভৃতি আঘাত প্রাপ্ত হলে মস্তিষ্কের সংবেদনশীল শিরা এবং ধমনীগুলিও আক্রান্ত হয় ফলে আমাদের মাথা ধরে। মাথার কাছে কিংবা ঘাড়ের উপরকার দিকের মাংসপেশির সংকোচনের ফলেও মাথা ধরতে পারে। তাছাড়া পেটে গ্যাস হলেও অনেক সময় মাথা ধরতে দেখা যায়।

এ্যাজমা

এক প্রকার শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ। পুরাতন কাশি বসে গেলে, রক্তে ইয়োসিনোফিল বৃদ্ধি পেলে, অজীর্ণ রোগ বা জন্মগত কারণেও এই রোগ হতে পারে। এই রোগে ক্রমাগত কাশি হতে থাকে ফলে রোগী এক সময় হাঁপিয়ে উঠে, রোগীর শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। গলা সাঁই সাঁই করতে থাকে এবং বুকে চাপ সৃষ্টি হয়।

অম্ল

অম্ল বা অ্যাসিডিটি এক প্রকার অজীর্ণ রোগ। পাকস্থলি থেকে অধিক মাত্রায় পাক রস বের হওয়ার ফলে এই রোগ হয়। এই রোগের লক্ষণ হল মুখ দিয়ে উঠা কোষ্ঠকাঠিন্য, বুক জ্বালা, মাথা ধরা, পিপাসা পেটফুলে উঠা, মুখ দিয়ে অম্ল ঢেকুর, খাবারের আগে অথবা পরে গলা জ্বালা প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। দীর্ঘদিন যাবৎ এই রোগে ভুগলে আলসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জন্ডিস

রক্তের বাইল রঞ্জক নিঃসরণ হওয়া এবং মূত্র, চর্ম, শরীর হলদে যাওয়াকে পাণ্ডুরোগ বা জন্ডিস বলে। মদ্যপান, যকৃতের গন্ডগোল, অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পিত্তপাথরী প্রভৃতি কারণে জন্ডিস রোগ হয়। এই রোগ হলে রোগীর গায়ের চামড়া, চোখের সাদা অংশ, মূত্র প্রভৃতি হলুদ হয়ে যায়। এই সব ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময় পিত্তবমি, দুর্বলতা, অবসন্নতা, জ্বর জ্বর ভাব ক্ষিধে না

পাওয়া মুখে ততো স্বাদ, অরুচি, জামা কাপড়ে গায়ের ঘাম লেগে হলদে হয়ে যাওয়া প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। জন্ডিস থেকে লিভারে ফোড়া, লিভার সিরোসিস এমনকি ক্যান্সার রোগ পর্যন্ত হতে পারে।

স্কিজোফ্রেনিয়া

স্কিজোফ্রেনিয়া এক রকম মনোবিকার, যাতে রোগী এক সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতে বাস করতে আরম্ভ করে। তার কাছে বাস্তব জগতের চেয়েও ঐ জগত বেশি বাস্তব।

আলসার

ত্বক বা কলার ক্ষতকে আলসার বলে। বিভিন্ন বয়সে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আলসার হতে পারে। অখাদ্য খেলে বা মৃদু সংক্রামণে মুখে ঘা হতে পারে। পায়ের চামড়া ফাটা ও রক্ত চলাচলের স্বল্পতাহেতু একধরনের আলসার হতে পারে। যেসব আলসার বহুদিন ধরেও সারতে চায় না সেগুলো বিপজ্জনক ক্যান্সার জাতীয় হতে পারে। অনিয়মিত আহার বা অত্যধিক মদ্যপান ইত্যাদির থেকে পাকস্থলী এবং যকৃতের আলসার হতে পারে।

বার্ড ফু

আর্থোমিক্সিডাইরিডি গোত্রের এই ভাইরাস রোগের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ১৮৭৮ সালে। ১৯৫৫ সালে ইতালিতে আবার এই একই রোগ ‘ফাউল প্লেগ’ নামে পরিচিত হয়, যা আজকের বার্ড ফ্লু বা ‘অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা’। এটি খুব দ্রুত এক প্রাণীর দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে ছড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এই অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। এটি সার্স ভাইরাসের চেয়েও বিপজ্জনক। সার্স ভাইরাস মেলামেশার মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমিত হয়। অন্যদিকে বার্ড ফ্লু ভাইরাস কিন্তু সে রকম নয়। এই ভাইরাসটি দ্রুত রূপ বদল করতে সক্ষম হওয়ায় এটি চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা এই ভাইরাসটি চিনতে না পারলে এটি খুব সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যা বড় ধরনের বিপদ ও আতঙ্ক হয়ে দেখা দিতে পারে। অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব কিন্তু একদম নতুন নয়। এটি গত শতকের দিকেও দেখা দিয়েছিল। ১৯১৮ সালে স্পেনে এটি প্রথম দেখা দেয়। এই ভাইরাসের আক্রমণে সে সময় ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। অন্যদিকে এশিয়া মহাদেশে বর্তমানে H₅N₁ নামে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি হাঁস-মুরগিকে আক্রমণ করছে, মানব দেহে তার প্রথম চিহ্ন পাওয়া যায় ১৯৯৭ সালে হংকংয়ে। এশিয়াতে এই অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে যে এই নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।